দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র

'গীতায় ঈশ্বরবাদ' 'কর্মবাদ ও জন্মান্তর'
'প্রেমধর্ম' 'সাংখ্যপরিচয়' প্রভৃতি
গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্‌-এ, বি-এল, বেদান্তরত্ন প্রণীত

সন ১৩৪৭ সাল

 [মূল্য ১॥০

প্রকাশক
শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩৯বি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীগৌরচন্দ্র সেন, বি.কম
শ্রীভারতী প্রেস
১৭০, মানিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ১৩৪৪-৪৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। এ সম্পর্কে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি সহর (যাহার সন্নিকটস্থ দরিয়াপুর গ্রাম 'কপালকুণ্ডলা'র পরিকল্পনাক্ষেত্র) অগ্রণী ছিলেন। ঐ স্থানেই উৎসব যজ্ঞের প্রথম বেদী রচিত হয়।

উদ্‌যোগকর্তাদিগের আহ্বানে আমি ঐ উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলাম এবং 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' সম্বন্ধে একটি মৌখিক অভিভাষণ দিয়াছিলাম। সেই বীজ হইতেই এই গ্রন্থের উৎপত্তি। ঐ অভিভাষণ পরে সম্প্রসারিত করিয়া আমি 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হই। ঐ গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় (এখন যাহা প্রথম খণ্ডে নিবদ্ধ হইল) 'পরিচয়' নামক মাসিকপত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ভগবদ্‌গীতার সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ঐ গীতাকে তিনি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বিবেচনা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক মতের পরিচয় দিতে হইলে ঐ ভগবদ্‌গীতার আলোচনা অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য আমার গ্রন্থের অঙ্গরূপে ভগবদ্‌গীতা সম্বন্ধে কয়েকটি অধ্যায় লিখিত হইয়া 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ অধ্যায়গুলি এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে দার্শনিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব-ক্ষেত্রে তাঁহার অপূর্ব অবদান—'কৃষ্ণচরিত্র'। শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গে তাঁহাকে অবতারতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইয়াছিল। দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের

পরিচয় দিতে আমিও কৃষ্ণচরিত্র ও অবতারবাদের আলোচনা করিয়াছি। পাঠক ঐ আলোচনা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দৃষ্টি করিবেন।

পরিশিষ্টে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লিখিত চারিটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পাঠক তাহা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাজাত্যবোধের পরিচয় পাইবেন এবং পাইকপাড়ার 'অভিভাষণে' বঙ্কিম-প্রতিভার সার্বভৌমত্বের কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া গৌরব অনুভব করিবেন।

১লা বৈশাখ
১৩৪৭ সাল

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সূচিপত্র

উপক্রম

প্রথম অধ্যায়

মূল কথা

১২৭৯ বঙ্গাব্দের শুভ ১লা বৈশাখ (ইং ১৪ই এপ্রেল, ১৮৭২) বাংলার সাহিত্য-পঞ্জীতে একটি সু-পুণ্য তিথি। ঐ দিন যুগ-প্রবর্তক 'বঙ্গদর্শনে'র জন্ম-দিন। চার বৎসর মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন—তথাপি ঐ বর্ষ-চতুষ্টয় বঙ্গীয় সাময়িক সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ।

'বঙ্গদর্শনে'র পূর্বেও কয়েকখানি বাংলা মাসিক প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রবর্তিত 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারী-চাঁদ মিত্র, রামনারায়ণ, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতেন। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র প্রথম প্রকাশ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল ছয় বৎসর ধরিয়া বেশ দক্ষতার সহিত ঐ পত্রিকা পরিচালনা করিয়া ১৮৬০ সালে উহার সম্পাদক-পদ পরিত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলার আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ১৮৫৫ সালে 'বিদ্যোৎ-সাহিনী' পত্রিকা ও ১৮৫৬ সালে 'সর্বতত্ত্ববিকাশিকা' পত্রিকা প্রচার করিয়া বাংলা মাসিক সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি প্রস্তুতই ছিলেন এবং ডাঃ রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র সংস্রব ত্যাগ

করিলে কালীপ্রসন্ন সিংহ উহার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া* আট মাস ধরিয়া ঐ পত্রিকা প্রকাশ করেন।† তখনও 'বঙ্গদর্শন' ভবিষ্যতের গর্ভে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে 'বঙ্গদর্শনে'র পূর্বে কোনও বাংলা মাসিকপত্র শিক্ষিত সমাজের চিত্তহরণ করিতে পারে নাই। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব। ইহার অন্যতম—হয়ত' মুখ্যতম কারণ এই ছিল যে, 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যা হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশ হইতে থাকে।

'বঙ্গদর্শনে'র দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র সর্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা করিতেন—তাঁহার ঐ প্রচেষ্টা যে অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায়। এ সম্পর্কে তাঁহার নিজের কথা এই :—

'যেমন কুলি-মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।' ‡

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে নিজের 'মজুরদারি'র উল্লেখ করিলেন—ইহা বিনয়ের পরাকাষ্ঠা বটে কিন্তু এ আত্মগ্লানি

* তদুপলক্ষে তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন—'যিনি (ডাঃ রাজেন্দ্রলাল) বাঙ্গালি ভাষারে বিবিধ তত্ত্বালংকারে অলংকৃত করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।' অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বঙ্গজননীর এই সুসন্তান (কালীপ্রসন্ন সিংহের) জীবনদীপ মাত্র ৩০ বৎসরে ১৮৭০ সালে নির্বাপিত হইয়াছিল।

† উল্লিখিত বিবরণ ১৩৪৪ সালের ২য় সংখ্যা 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' প্রকাশিত শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

‡ 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের বিজ্ঞাপন।

অনাবশ্যক। প্রকৃত কথা এই—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী ছিল—সুতরাং 'বঙ্গদর্শনে'র ক্ষেত্রে নানা খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। দর্শনধারা—যাহা সংপ্রতি আমার আলোচ্য—ঐ বিচিত্র ধারা-সমূহের অন্যতম ছিল।

'অনুশীলন'-গ্রন্থের এক স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র আপন দার্শনিক প্রচেষ্টার কিছু পরিচয় দিয়াছেন।

'অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত—'এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়াছি।' ইত্যাদি

এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শন-চিন্তার উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়।*

ধর্ম দর্শনের অন্তরঙ্গ—অন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই মনে করিতেন। তাঁহার প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ—'ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলন'। বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন

---

* এই দার্শনিক চিন্তার কয়েকটি প্রাথমিক সুফল বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' 'জ্ঞান' 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র' 'মনুষ্যত্ব কি?' প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল পাঁচ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ সাংখ্য দর্শন বিষয়ক নিবন্ধ। আমার বিশ্বাস সে যুগে উহাই বাংলায় প্রথম সাংখ্য মতের বিবৃতি। পরে ঐ সম্পর্কে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু অদ্যাপি বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ বিবৃতি জরতী (out of date) হইয়া যায় নাই।

—আদর্শ ভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় না। তাঁহার নিজের কথায় বলি— 'আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া তারপর উদাহরণ দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়।' সেই জন্য 'ধর্মতত্ত্বে'র পর 'কৃষ্ণচরিত্র'। 'ধর্মতত্ত্বে' মাত্র যাহা তত্ত্বমাত্র, 'কৃষ্ণচরিত্রে' তাহা দেহবিশিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মানব এবং সম্পূর্ণ ধর্ম তাঁহাতেই আকারপ্রাপ্ত।

'ধর্মাচরণ জন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্মজীবন নাই। সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই, জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধর্মাধর্ম-জ্ঞান সম্ভবে না। ধর্মজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সম্ভবে না এবং যেখানে অন্য মনুষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, সেখানে মনুষ্যে প্রীতি প্রভৃতি ধর্মও সম্ভবে না।'†

সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' ও পরে 'প্রচারে' নানা সামাজিক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রবন্ধের অধিকাংশ পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ‡

অতএব 'দার্শনিক' বঙ্কিমচন্দ্রকে জানিতে হইলে এবং তাঁহার

---

† ধর্মতত্ত্ব—ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

‡ ১২৭৯ হইতে বঙ্কিমচন্দ্র চার বৎসর 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার পর এক বৎসর বঙ্গদর্শন বন্ধ থাকে। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে তাঁহার ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্পাদকতায় 'বঙ্গদর্শন' পাঁচ বৎসর পরিচালিত হইয়াছিল। ঐ কয়েক বৎসরের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের নানাবিধ প্রবন্ধ ও কয়েকখানি বিখ্যাত উপন্যাস (যথা,—চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণীর কিয়দংশ) প্রকাশিত হয়। ১২৯১ শ্রাবণ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' নামক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। 'প্রচার' ১২৯৫ চৈত্র পর্যন্ত চলিয়াছিল। ঐ 'প্রচারে' তাঁহার কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধ এবং 'সীতারাম' উপন্যাস ও তৎকৃত 'গীতাভাষ্য' প্রকাশিত হয়। 'প্রচারের' সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 'নবজীবন' নাম দিয়া এক মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন। ঐ 'নবজীবনে' বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'অনুশীলন তত্ত্বের' অনেকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ধার্মিক ও দার্শনিক মত বুঝিতে হইলে ঐ 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'বিবিধ প্রবন্ধে'র নিবিষ্ট ও নিবিড় ভাবে আলোচনা করিতে হয়। আমি যথাসাধ্য ঐরূপ আলোচনা করিয়া তবে 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রে'র বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক মতের বিবৃতি করিব এবং যেস্থলে তাঁহার মত অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ মনে হইবে, সেখানে তাহার সংপূর্তি করিবার চেষ্টা করিব। অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য সংস্তুতি (appreciation) মাত্র নয়—সমালোচনাও বটে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের প্রকৃত পরিমাপ করিতে হইলে, তিনি যে বেষ্টনীর মধ্যে বর্ধিত হইয়াছিলেন তাহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। পলাশির যুদ্ধের পর ৮১ বৎসর অতীত হইলে ১২৪৫ বঙ্গাব্দ ১৩ই আষাঢ় (২৭শে জুন, ১৮৩৮) এক পুণ্যতিথিতে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। ইতিমধ্যে বঙ্গ বিহার আসাম উড়িষ্যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে—অনেক বাদ-বিবাদ আপত্তি-বিপত্তির পর বাংলাদেশে ইংরাজি শিক্ষার ভূয়ঃ প্রচার হইয়াছে। রামমোহন-যুগে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ ও গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—তারপর এখন প্রায় প্রত্যেক জিলায় জেলা-স্কুল ও কোথাও কোথাও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (বঙ্কিমচন্দ্রের যখন বয়স ৬ বৎসর—তখন তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের ছাত্র হইয়াছিলেন—তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র তখন মেদিনীপুরের ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট্)। সিপাহী মিউটিনির পর বর্ষে (বঙ্কিমচন্দ্রের তখন বয়ঃক্রম ২০ বৎসর) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ঐ ইংরাজি শিক্ষার প্রসার ও প্রতিপত্তি আরও বদ্ধমূল হইল। ফলে? পাশ্চাত্য শিক্ষার মাদক বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া উহাকে বিলোড়িত ও বিকৃত করিল।

বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত হইল—সে ভুলিয়া গেল সে ঋষি-সন্তান—প্রাচীনতম সভ্যতার উত্তরাধিকারী। 'দেশশুদ্ধ জোন্‌স্, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইতে চলিল।' * অনেক বি-এ, এম্-এ উৎপন্ন হইল বটে (বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরের বি-এ-গ্রাজুয়েট), কিন্তু তাহারা Bachelors of Arts ও Masters of Arts না হইয়া (থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা অল্‌কট্ সাহেবের ভাষায়) 'Bad Aryans' ও 'Mad Aayans'-এ পরিণত হইল। সে কালের মনোভাব বর্ণনা করিয়া আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি :—

With the English-educated classes—with whom as the result of their contact with the West, materialism and atheism were the order of the day, who were profoundly ignorant of the majesty and grandeur of their own religion and who 'in their hourly increasing selfishness never seemed to remember that they had a mother, degraded, fallen down and trampled under the feet of all—but *still mother*'—to them Hinduism at that time appeared little better than a mass of superstitious practices and time-grown corruptions. Then again, not being the religion of the dominant race in India, it was the constant and convenient target for missionary ridicule.

এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এইরূপ লিখিয়াছেন—'আমাদের মধ্যে এমন অনেক বাবু আছেন, কাচের টামব্লারে না খাইলে তাঁহাদের জল মিষ্ট লাগে না।' স্মরণ রাখিতে হইবে যে যাহাকে আমরা 'Hindu Revival' বলি, তখনও সে প্রতিক্রিয়া সুরু হয় নাই।

* বঙ্কিমচন্দ্রের 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' প্রবন্ধ।

সেইজন্যই স্বদেশ-বৎসল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে এই বলিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল—

কতরূপ স্নেহ করি' দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

পাশ্চাত্য প্রভাবের আর একটি ফল দেখা দিয়াছিল ইংরেজি-শিক্ষিতদিগের দৈনন্দিন জীবনের অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতায়। মনস্বী রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'সেকাল ও একাল' পুস্তিকায় এবং মাইকেল মধুসূদন তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে উহার নিখুঁত ফটো তুলিয়াছেন। মধুসূদনের নিজের জীবনই ঐ অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার জাজ্বল্য নিদর্শন। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—'উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রেমপিপাসা (রিরংসা বলিলেই ভাল হয়) এবং অসংযতেন্দ্রিয়তায় তিনি বায়রন্। * * সকল পাইয়াও মধুসূদনের ন্যায় হতভাগ্য কবি বঙ্গদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।'

প্রথম যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্রও পাশ্চাত্য মোহমুক্ত ছিলেন না—কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঐ মোহ অল্পদিনেই কাটিয়া গিয়াছিল। ১২৮৫ অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' তাঁহাকে লিখিতে দেখি :—

'দক্ষযজ্ঞে, বিশ্বযজ্ঞে ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? চল ভাই, ব্রাণ্ডি টানিয়া থিয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টপ্পা শুনিয়া আসি। এই অল্প ইংরেজীতে শিক্ষিত, ধর্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল।'

সে যুগে মদ্যপান সভ্যতার পরিচায়ক ছিল কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' (অষ্টম অধ্যায়ে) লিখিয়াছেন—'মদ্য যে অনিষ্টকারী, অনুশীলনের হানিকর, এবং যাহাকেই তুমি ধর্ম বল—তাহারই বিঘ্নকর,—এ কথা

বোধ করি তোমাকে কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না।' এমন কি সেই হাক্স্লি-টিন্‌ডেল্-এর জড়বাদ-প্রভাবিত যুগে—যখন শিক্ষিত বাঙ্গালি শিখিতেছিল—There is a Here but no Hereafter * * In Matter is the only promise and potency of Life—সেই যুগে তিনি বিজ্ঞানময়ী ঊনবিংশ শতাব্দীকে 'পোড়ারমুখী' বলিতে দ্বিধা করেন নাই।

'এখন বিজ্ঞানময়ী ঊনবিংশ শতাব্দী। সেই রক্তমাংসপূতিগন্ধশালিনী কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচ্‌লোডার-টর্পীডো প্রভৃতিতে শোভিতা রাক্ষসী,—এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তৎসমুদায় ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ার-মুখী এদেশে আসিয়াও কালামুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না।' (ধর্মতত্ত্ব—সপ্তম অধ্যায়)

এই তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ঐ 'ধর্মতত্ত্বে' অন্যত্র লিখিতেছেন—

'মুখস্থ কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চটপট করিয়া বলিতে পার। তারপর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইল কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল * * জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি বুড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে কি আপনি আহারার্জনে সক্ষম হইল, সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গর্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়—বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে, তাহারা পালে মিশিয়া স্বচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে।'

ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা। অ-পরিণত বয়সে শিক্ষিতের প্রতি প্রযুক্ত কষাঘাত আরও তীব্রতর। 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বৎসরে প্রকাশিত 'অনুকরণ' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

জগদীশ্বর-কৃপায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালী নামে এক অদ্ভুত জন্তু জগতে দেখা দিয়াছে * * কোন কোন তাম্রশ্মশ্রু ঋষির মত এই যে, যেমন বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহপূর্বক এই অপূর্ব 'নব্য বাঙ্গালী'-চরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা, গর্দভ হইতে গর্জন—এই সকল একত্র করিয়া দিঙ্‌মণ্ডল-উজ্জ্বলকারী ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত এবং ভট্ট মোক্ষমূলরের আদরের স্থল নব্য বাঙ্গালীকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন। * * গোরু হইতে বাঙ্গালী কিসে অপকৃষ্ট? গোরুও যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালাও সেইরূপ। ইহারা সংবাদপত্ররূপ ভাণ্ড ভাণ্ড সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে; চাকরি-লাঙ্গল কাঁধে লইয়া জীবনক্ষেত্র কর্ষণ-পূর্ব্বক চাষার ফসলের যোগাড় করিয়া দিতেছে; বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কলেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া চিনির বলদের নাম রাখিতেছে; সমাজসংস্কারের গাড়ীতে বিলাতী মাল বোঝাই দিয়া রসের বাজারে চোলাই করিতেছে, এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থ-সর্ষপ পেষণ করিয়া যশের তেল বাহির করিতেছে। এত গুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে?

এই শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চাবুকের মত আমাদের মর্মে বাজে—কিন্তু

অত্যুক্তি হইলেও উক্তিটি এ কালেও আমাদের প্রণিধান-যোগ্য নয় কি ?

সে যুগে ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর উপর প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পাশ্চাত্য-দিগের (যাঁহাদের Orientalists বলে) একাধিপত্য ছিল। তাঁহাদের কথায় ইঁহারা উঠিতেন বসিতেন। অবশ্য Orientalist-দিগের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা খুবই প্রশংসনীয়। Facts-এর সন্নিবেশে ও সমীকরণে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত—কিন্তু যখনই Theory-র ভূমিতে আরোহণ করেন, তখনই সন্ত্রস্ত হইয়া বলিতে হয়—'সাধু! সাবধান'! এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের যেরূপ সতর্ক করিয়াছেন—তাহা অন্যত্র দুর্লভ। তাঁহার 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—

ইউরোপীয়েরা এ দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচনা পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্য জগতে আর কিছুই হইতে পারে না। আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই। এখনও অনেক বাঙ্গালী তাহা পাঠ করেন,—তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

মূল কথা সম্পর্কে অন্যান্য বক্তব্য আগামী অধ্যায়ে বলিব।

৺ ১৭ ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

মূল কথা

(২)

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স যখন ২০ বৎসর, তখন (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, পাশ করিলেন। অমনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ছোট লাট হ্যালিডে সাহেব আগষ্ট মাসে তাঁহাকে ডেপুটিগিরিতে ভর্তি করিয়া লইলেন। তখনকার রাজপুরুষেরা শিক্ষিত বাঙ্গালীকে এইরূপ সুনজরে দেখিতেন—এই ৮০ বৎসরে কি সাংঘাতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে! দেড় বৎসর যশোহরে শিক্ষানবিশির পর বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬০, জানুয়ারিতে মেদিনীপুর জেলার নেগুঁয়া মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইলেন। তখনও ঐ মহকুমার কেন্দ্র কাঁথিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—তবে ইহা নিঃসংশয় যে, মহকুমা পরিদর্শন উপলক্ষে শুধু কাঁথি নয়, চাঁদপুর, দরিয়াপুর প্রভৃতি গ্রামেও বঙ্কিমচন্দ্রকে অবস্থান করিতে হইত। ঐ দরিয়াপুরের অবিদূরে রসুলপুর নদী সাগর-সঙ্গমে প্রবেশ করিয়াছে। নিকটে বহুযোজনব্যাপী বালিয়াড়ি। ঐ দরিয়াপুরই বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'র পরিকল্পনা-ক্ষেত্র।

নেগুঁয়াতে দশ মাস রাজকার্য করার পর নভেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় বদলী হন। জানুয়ারীতে যখন তিনি নেগুঁয়ায় আসেন তখন

তিনি বিপত্নীক। নেগুঁয়ায় অবস্থানকালে জুন মাসে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর নাম রাজলক্ষ্মী দেবী। এ বিবাহ তাঁহার পক্ষে প্রকৃতই 'শুভ' বিবাহ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে নিজে লিখিয়াছেন—

'একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি না।'

কবিবর নবীনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিতেন। তিনি রাজলক্ষ্মী দেবী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রীর চরিত্র তাঁহাকে novelist করিয়াছে। তিনিই—সূর্যমুখী।'

ইহার পর সার্ভিসের ধারানুযায়ী নানা ঘাটের জল খাইয়া (যথা,—খুলনা, বারাসত, হুগলী, মেদিনীপুর প্রভৃতি) বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে আলিপুরে পোষ্টেড্ হন এবং ১৮৯১, সেপ্টম্বর মাসে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি আড়াই বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার আয়ুঃসূর্য অস্ত যাইবার দিন—অর্থাৎ তাঁহার বিজয়-বাসর ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪—২৬শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩০০। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৫৬ বৎসর। তখনও শক্তি অক্ষুণ্ণ, চিত্তধারা অফুরন্ত। বাংলা সাহিত্যের শোচনীয় দুর্ভাগ্য বটে!

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে (১২৭০ সাল) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। যতদূর জানা যায় ইহাই তাঁহার প্রথম বাংলা গদ্য রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহাস্পদ বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্বন্ধে ১৩০১ সনের 'সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা'য় এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"যখন 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে

প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতি গান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা, এবং পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে, একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে,—নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।"

ইহার পর ১৮৬৬ সালে 'কপালকুণ্ডলা' এবং ১৮৬৯ সালে 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালী পাঠকের চমক স্থায়ী বিস্ময়ের আকার ধারণ করিল। তখন ১২৭৯ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৭২ সনে) বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' লইয়া মাসিক-সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র কথা পূর্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি—এখানে পুনরুক্তি করিব না। তবে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে 'বঙ্গদর্শন'-প্রকাশের কালে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের কিরূপ অবস্থা ছিল।

দামুণ্যার দরিদ্র কবি মুকুন্দরাম ও নবদ্বীপের রাজকবি ভারতচন্দ্রের সহিত নবাবি আমল চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। পলাশি-যুদ্ধের পর প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইতে চলিয়াছে। পাঁচালি ও কবি-ওয়ালার গানের খরস্রোতে ভাঁটা পড়িয়া আসিতেছে। উপচীয়মান বিলাতী বন্যার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নবযুগের কবিগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'মাতৃসমা মাতৃ-ভাষা'র স্তুতিগান গাহিয়া নীরব হইয়াছেন। দীনবন্ধু নীলকর-প্রপীড়িত বাংলার মর্মব্যথামুখরিত 'নীলদর্পণ' রচনা করিয়াছেন এবং পাদ্রি লংসাহেব তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন।

নীলবানরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারেখার
অসময়ে হরিশ মলো লংয়ের হল কারাগার!

মাইকেল মধুসূদন—যিনি কবি-প্রতিভার প্রথমোচ্ছ্বাস 'Captive

Lady' প্রভৃতি ইংরেজী কাব্যরচনায় প্রকাশ করিয়াছিলেন—এখন (১৮৬০ খৃষ্টাব্দে) অনুতপ্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 'অম্বুনাদে কম্বুনাদে' 'মেঘনাদ বধ' গান করিয়া মধুচক্র রচনা করিয়াছেন।

—গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

মধুসূদন এখন মর্মে মর্মে বুঝিয়াছেন:—

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা' সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধনলোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!

* * *

স্বপ্নে তবে কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে
'ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে।'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ—যাঁহার Motto ছিল—

নানান দেশে নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা না পূরে আশা

—তিনি প্রকাশ্য সভায় মধুসূদনকে অভিনন্দিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

'আপনা কর্তৃক যেন ভাবী বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল-বিগলিত অশ্রুজল মার্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন

বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা-সপত্নীর পদাবনত হইয়া চির সন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়।'

কিন্তু এ সকল অরণ্যে রোদন দেশের বধির কর্ণে প্রবেশ লাভ করে নাই। তাই দেখি বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র অনুষ্ঠান পত্রে আক্ষেপ করিতেছেন :—

"লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য, মিটিং, লেক্‌চার, এড্রেস, প্রোসিডিংস্, সমুদয় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক্, পত্রলেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। * * আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃতসিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না।"

(প্রথম বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু নিজেই এই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'Rajmohan's wife'ইংরাজীতে লিখিত হইয়া 'Indian Field'-নামক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে তিনি উহার কিয়দংশের বাংলা করিয়াছিলেন।) সে যাহা হ'ক পরে দেখি বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বঙ্গভাষার প্রতি অবজ্ঞা জন্য কঠোর তিরস্কার করিতেছেন।

'বাঙ্গালা বুঝিতে পারি'—এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না-কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে,—যে তাহার অনুশীলন করে,

তাহাকেও ঘৃণা করে এবং আপনাকে মাতৃভাষা-অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজি-নবিশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পায়।'

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সহিত যদি বঙ্কিম-যুগের আরম্ভ ধরা যায়, তবে ১৮৯৪-এ তাঁহার তিরোধানের সহিত ঐ যুগের শেষ। এই ৩০ বৎসরের মধ্যে শেষ দশ বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ ভাবে ধর্মালোচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। প্রথম বয়সে তিনি স্বভাবতঃ নবীনতার অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁহার প্রাচীনতার প্রতি পক্ষপাত হয়। তিনি 'ধর্মতত্ত্বে'র একস্থলে লিখিয়াছেন---

আমার সব কথাই পুরাতন। নূতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। * * আমি সেই আর্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যান পূর্বক, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি।

সেই জন্য দেখি প্রাচীন প্রথা 'কথকতা'র প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং ইহাকেই তিনি লোকশিক্ষার মুখ্য উপায় মনে করিতেন। তাঁহার নিজের কথা এই :—

গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বেদী-পিঁড়ির উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস্-নুদুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জুনের বীরধর্ম, লক্ষণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ-বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলংকার-সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পিঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত— শিখিত যে, ধর্ম নিত্য, ধর্ম দৈব, যে, আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে, পরের জন্য জীবন, যে, ঈশ্বর আছেন, বিশ্বসৃজন করিতেছেন, বিশ্বপালন

করিতেছেন, বিশ্বধ্বংস করিতেছেন, যে, পাপপুণ্য আছে, যে, পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে, জন্ম আপনার জন্য নহে পরের জন্য, যে, অহিংসা পরম ধর্ম, যে, লোকহিত পরম কার্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্যযুবকের কুরুচির দোষে।

এমন কি, আধুনিকদিগের দৃষ্টিতে যে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় চালকলার যম হইয়া ভারতবর্ষকে অধঃপাতে দিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদিগেরও স্তুতিবাদ করিয়াছেন।

"হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারাই ধর্মবেত্তা, তাঁহারাই নীতিবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্তা, তাহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্যপ্রণেতা, তাঁহারাই কবি।

সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। * *

দেখ, বিধি, বিধান, ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা-সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্যের পর্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটি উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—ভিক্ষা! এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্য-শ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

* * যথার্থ নিষ্কামধর্ম যাঁহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারাই পরিহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়া এরূপ সর্বত্যাগী হইতে পারেন।

* * পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধার্মিক কোন জাতিই নহে। প্রাচীন এথেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালি, আধুনিক জার্মাণ বা ইংলণ্ডবাসী—কেহই তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না ; রোমক ধর্মযাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধার্মিক ছিলেন না।"

আরও লক্ষ্য করা যায়—প্রবীন বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাঁহার 'ধর্মতত্ত্বে' এই পক্ষপাতের ভূয়ঃ ভূয়ঃ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করি।

"অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ—হিন্দুধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ * * হিন্দু-ধর্মের মত সর্বাঙ্গসম্পন্ন ধর্ম আর দেখা যায় না * * ইউরোপের ধর্ম—বিশেষতঃ পূর্বতন ইউরোপের ধর্ম, হিন্দুধর্মের মত উন্নত ধর্ম নহে। * * মনুষ্যে প্রীতি হিন্দুশাস্ত্রের মতে ঈশ্বরে ভক্তির অন্তর্গত—এই এক কথাতেই সকল ধর্মের উপর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল * * হিন্দুধর্ম যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা তদ্বিষয়ে অন্যতর প্রমাণ।"

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুশাস্ত্রকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'যেমন সমুদ্রনিহিত রত্নের যথার্থ স্বরূপ ডুব দিয়া না দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি অগাধ সমুদ্র হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরে ডুব না দিলে তদন্তর্নিহিত রত্ন সকল চিনিতে পারা যায় না।'

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত হিন্দুধর্ম কি ? সে ধর্ম বৈদিক ধর্ম নয়—

উপনিষদের ধর্ম নয়—বুদ্ধের জ্ঞানময় ও ধ্যানময় ধর্ম নয়—তাহা পৌরাণিক হিন্দুধর্ম। এ সম্পর্কে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"আমাদের সর্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার যত পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা কেবল ইহাকে সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার প্রথমাবস্থা ঋগ্বেদসংহিতার ধর্ম আলোচনায় জানা যায় ; যাহা শক্তিমান্ বা উপকারী বা সুন্দর তাহারই উপাসনা এই আদিম বৈদিক ধর্ম। তাহাতে আনন্দভাব যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সতের ও চিতের উপাসনার অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল। এইজন্য কালে তাহা উপনিষৎ সকলের দ্বারা সংশোধিত হইল। উপনিষদের ধর্ম—চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনা। তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। ব্রহ্মানন্দ-প্রাপ্তিই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন ও স্ফূর্তির পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্মে কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্মে উপাসনা নাই। বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না, এবং তাঁহাদের ধর্মে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্মের একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিকদিন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধর্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম হইবার উপযুক্ত এবং এই কারণেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্মকর্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে পারে নাই।"

কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র গতানুগতিক ছিলেন না। তিনি স্বীকার করিতেন—

"হিন্দুধর্মে অনেক জঞ্জাল জমিয়াছে—ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দুধর্মের মর্ম যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যক ও অনাবশ্যক অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে। তাহা না করিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই।"

প্রকৃত হিন্দু কে? ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—

"সর্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ জ্ঞান-ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তদ্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত—তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে কপাল জোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে ম্লেচ্ছের অধম ম্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর হিন্দুয়ানি যায়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমোদিত হিন্দুধর্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা আমাদের প্রণিধান-যোগ্য—

'তিনি হিন্দুধর্মের যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, আমার মতে তাহা আধুনিক সময়ের একটি লক্ষণ—একটি চিহ্ন স্বরূপ। অনৈক্য স্থলে ঐক্য-সংঘটন, অনুদার মত ও আচারের স্থলে উদার মত ও আচার-সংস্থাপন, নির্জীব অনুষ্ঠানের স্থলে প্রাচীন ধর্মের সঞ্জীবনী শক্তি-প্রচার-করণ, অজ্ঞানতার ও মুর্খতার স্থলে হিন্দুধর্মের জ্ঞান-বিতরণ, অবনতির স্থলে উন্নতির পথপ্রদর্শন,—এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাব, এইরূপ আশা আজ বঙ্গ-সমাজে কিছু কিছু অনুভূত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি এই ইচ্ছা, এই ভাব ও এই আশার বিকাশমাত্র।'

এ অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক মতের মূলকথাগুলি শেষ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু সকল কথা বলা হইল না। আগামী অধ্যায়ে বক্তব্য শেষ করিব।

তৃতীয় অধ্যায়

মূলকথা

(৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক মতের মূল কথাগুলি বলিতে হইলে প্রথমেই তাঁহার মত-পরিবর্তনের কথা বলিতে হয়।

ধারাবাহিক ভাবে বঙ্কিম-সাহিত্যের আলোচনা করিলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তি এই :—

'আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণ বিষয়েই আমার পরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যতদূর প্রভেদ, এতদুভয়ে ততদূর প্রভেদ। মত পরিবর্তন—বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাহার কখনও মত পরিবর্তন হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞান-বিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন।'

অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র অসঙ্গতি-জুজুর ভয় রাখিতেন না। মনস্বী এমার্‌সন্ বলিয়াছেন—Consistency is the hobgoblin of little minds—অর্থাৎ, সঙ্গতি ক্ষুদ্রচেতাদিগের উপাস্য ব্রহ্মদৈত্য। তাহারা উহার ভয়ে সর্বদা সশঙ্কিত। বঙ্কিমচন্দ্র এ শ্রেণীর ক্ষুদ্রচেতা ছিলেন না।

সত্য বটে, নবীন বয়সে মিলের প্রভাবান্বিত হইয়া তিনি 'সাম্য'

গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলেন—All men are *not* born equal অর্থাৎ সম্ভাবনায় (potentially) সকলে সমান হইলেও জীবে জীবে জন্মগত সাম্য নাই :---বৈষম্যই প্রকৃতির রীতি। তাঁহার নিজের কথা এই—

"পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম এখন শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিকৃত তাৎপর্যে বুঝিয়া লইয়াছেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে বুঝি সর্বথাই সমান।"

বঙ্কিমচন্দ্র অধিকারী-ভেদ স্বীকার করিতেন। সেই জন্য তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন---'সকলে তুল্যরূপে মোক্ষাধিকারী নহে'।

আরও দেখা যায় পাশ্চাত্যের অনুমোদিত যে স্ত্রীপুরুষের সাম্য—বঙ্কিমচন্দ্র তাহার অনুমোদন করিতেন না। বৃত্তিতে ব্যাপারে শরীরে অধিকারে নর ও নারী সম নহে---বিষম। কে বড় কে ছোট সে প্রশ্ন উঠিতেছে না—কিন্তু উভয়ে কখনই তুল্যমূল্য নয়। অতএব উভয়ের পক্ষে তুল্যরূপ শিক্ষা, সাধন, জীবনযাপন অবিহিত। বঙ্কিম-চন্দ্রের নিজের কথা বলি :—

গুরু। ধর্মজন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজগঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহ প্রথা। বিবাহ প্রথার স্থূলমর্ম এই যে, স্ত্রী পুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্বাহ করিবে। যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত। পুরুষের ভাগ পালন ও রক্ষণ।

শিষ্য। তবে পাশ্চাত্যেরা যে স্ত্রীপুরুষের সাম্যস্থাপন করিতে চাহেন, সেটা সামাজিক বিড়ম্বনা মাত্র?

গুরু। সাম্য কি সম্ভবে? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্যপান করাইতে পারে? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি?

শিষ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকেরা ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোঁড়া প্রভৃতি পৌরুষকর্মে পটুতা লাভ করিয়া থাকে।

গুরু। অভ্যাসজনিত বিকৃতিক দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এ সকল বিচার না করিয়া উড়াইয়া দিলেই ভাল হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র গীতাভাষ্যের একস্থলে স্ব-ধর্মানুষ্ঠানতত্ত্ব বুঝাইতে বলিয়াছেন—

(পরধর্মের) তৃতীয় উদাহরণ, আমেরিকার স্ত্রীজাতির আধুনিক স্বধর্মত্যাগ ও পৌরুষকর্মে প্রবৃত্তি। ইহাতে ঘটিতেছে, স্ত্রীজাতির বৈষয়িক ভিন্নপ্রকার অবনতি, গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জাতীয় সুখ-হানি। যে স্ত্রীলোকে স্বগর্ভসম্ভূত শিশুকে স্তন্যদানে অসমর্থা, তাহাকে স্মরণ করিয়া, সহমরণাভিলাষিনী হিন্দু মহিলা অবশ্যই বলিবেন,—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।'

এই নারীপ্রগতি ও সাম্য-মোহের যুগে এ সকল কথা স্মরণ করা ভাল। আর স্মরণ করা ভাল যে, পাশ্চাত্যেও এ সম্পর্কে বেশ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে—হিট্‌লারের কবলিত জার্মানি ও মুসোলিনির প্রভাবিত ইটালি তাহার নিদর্শন। এ নিদর্শন যে এক-রাটের খামখেয়াল-প্রসূত নয়—ইহার যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, তাহা প্রদর্শিত করিবার জন্য দুই জন অভিজ্ঞ লেখকের অভিমত উদ্ধৃত করি।

In mind, body and feeling—in character, women are by nature designed to play a different part from men. These differences shew that that part is personal and not general, domestic not public, working by direct contact not by remote suggestion, through the imagination

more than through the reason, by the heart than by the head. * * that is to say, that the sphere in which the women act at their highest is the family, and the side where they are strongest is the affection.—Frederick Harrison's Realities and Ideals.

The human race is appoaching the parting of the ways for its future destiny. Either, speaking generally, the old division of labour, founded in nature, must continue—that by which the majority of women not only bear but bring up the new generation within the home * * * or on the other hand, woman must be brought up for relentless competition with men in all departments of production, thus necessarily losing more the power and the desire to provide the race with new human material. * * * If therefore we are to retain the old division of labour, under which the race has hitherto progressed, then women must be brought back to the home.—Ellen Kay's Love and Marriage. p. 211.

আশা করি ইহার অর্থ কেহই এরূপ বুঝিবেন না যে, নারী অবজ্ঞার পাত্র। কখনই না—

যত্র নার্য্যশ্চ পূজ্যন্তে রমন্তে সর্বদেবতাঃ—মনু

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' লিখিয়াছেন—

'রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী ;—রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া ; পুরুষেরা দেবতার সৃষ্টি মাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া।'

বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' লিখিয়াছেন—

'স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তিনি ভক্তির পাত্র।

হিন্দুধর্মে ইহাও বলে যে, স্ত্রীও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত, কেন না হিন্দুধর্ম বলে স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্মের অপেক্ষা কোম্‌ৎধর্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং শ্রদ্ধার যোগ্য। যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্মে বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ, সেখানে তাঁহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে।'

কুসাহিত্যের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ রোষ-দৃষ্টি ছিল—কু-সাহিত্যিককে তিনি বেশ তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন—

'যাহারা কুবাক্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করদিগের ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু, এবং তাহাদিগকে তস্করদিগের ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।'

'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"যাহা ইন্দ্রিয়াদি-উদ্দীপনার্থ বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য-ভাবের অভিব্যক্তি-জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা; তাহা পবিত্র, সভ্য ভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহাসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে।"

বিলাত হইতে আমদানী 'শ্লীলতাকে' বিদ্রূপ করিয়া তিনি ঐ প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতি জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে, তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ, আলতাপরা মলপরা পা-দর্শনে আপত্তি।"

পাশ্চাত্যের অনুকরণে কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে অশ্লীলতার স্রোতঃ খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে—যাহার ফলে বঙ্গ সাহিত্য ও সমাজ কলঙ্কিত ও কলুষিত হইতেছে, তৎসম্পর্কে আমি চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিরূপে যথোচিত আলোচনা করিয়াছিলাম। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। তবে পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিব যে, ঐ সম্মিলনের উদ্বোধন করিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভাষার অগ্রগতিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সাহিত্যের শুচিতা রক্ষার জন্য সাহিত্যিকগণকে সবিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এই পঙ্কিল উচ্ছৃঙ্খল উদগ্র অশ্লীলতার যুগে বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকিলে, বোধ হয় কশাঘাত করিয়াই নিরস্ত থাকিতেন না—বৃশ্চিক (scorpion) ও শঙ্করমাছ ব্যবহার করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন—"কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি"।

'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ-সাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।'

অধম অশ্লীলতাদ্বারা কখনই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হইতে পারে না। যিনি সুন্দর, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সত্য ও শিব—সত্যং শিবং সুন্দরম্। সাহিত্যিকেরা একথা কদাচ যেন বিস্মৃত না হন।

এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধে' লিখিয়াছেন—

'সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে, কেননা সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। যদি এমন কু-সাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও

অধর্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না।'

বঙ্কিমচন্দ্রের সাধারণ ধর্মমত কিরূপ ছিল? কোঁতের দৃষ্টবাদ, বেন্থামের হিতবাদ, মিলের হেতুবাদ (Rationalism) ও স্পেন্‌সরের অজ্ঞেয়-বাদ সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র কখনও ঈশ্বর প্রত্যাখ্যান করেন নাই। এমন কি—তাঁহার নবীন বয়সেরও কোন রচনা নাস্তিক্যগন্ধি নয়। তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"যদি বল, ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি।"

এমনকি কৃষ্ণচরিত্রের ষষ্ঠ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি লিখিয়াছেন—

"ঈশ্বর লীলার জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—তাঁহারই অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অবিদ্যায় আবৃত করাতেই উহা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের আধার হইয়াছে। অতএব সুখদুঃখ পাপপুণ্য তাঁহারই মায়াজনিত। তাঁহা হইতেই সুখদুঃখ ও পাপপুণ্য। দুঃখ যে পাই, তাঁহার মায়া; পাপ যে করি, তাঁহার মায়া। * *

"বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যম্ অসত্যম্ ত্বং বিষামৃতে।" 'তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা, তুমি সত্য, তুমিই অসত্য, তুমি বিষ, তুমিই অমৃত।' তিনি ভিন্ন জগতে কিছুই নাই। ধর্ম অধর্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, সত্য অসত্য, ন্যায় অন্যায়, বুদ্ধি দুর্বুদ্ধি সব তাঁহা হইতে।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন বটে—'পরকাল হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া

বিচার করিতে প্রস্তুত আছি' এবং ১২৮৪ সালের 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন বটে—'যদি পরলোক থাকে, তবে যে ব্যবহারে পরলোকে শুভ-নিষ্পত্তির সম্ভাবনা সেই কার্যেই ইহলোকেও শুভ-নিষ্পত্তির সম্ভাবনা'—কিন্তু পরিণত বয়সে রচিত 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি গুরুর মুখ দিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

'তুমি পরকাল মান না মান আমি মানি * * ইহকালে ও পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ তাহাই স্থায়ী সুখ * * ইহকালকে আমি একটি পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে সৎবৃত্তিগুলি মার্জিত ও অনুশীলিত করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাতীত স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া সেখানে তাহার অনন্ত সুখের কারণ হইবে।'

ঐ যে পরলোকের সুখ, বঙ্কিমচন্দ্র উহাকেই স্বর্গ এবং পরলোকের দুঃখকে নরক বলিয়াছেন।

তাঁহার নিজের কথা এই—

'কৃমিকীটসঙ্কুল অবর্ণনীয় হ্রদরূপ নরক বা অপ্সরা-কণ্ঠনিনাদ-মধুরিত, উর্বশী মেনকা রম্ভাদির নৃত্যসমাকুলিত, নন্দন-কানন-সুবাস-সমুল্লাসিত স্বর্গ মানি না। হিন্দুধর্ম মানি, হিন্দুধর্মের "বথামি"-গুলা মানি না।'

অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ ভৌম স্বর্গ-নরক মানিতেন না। তাঁহার মতে স্বর্গ-নরক স্থান নহে অবস্থান, place নহে state। আমি বলিতে চাই, স্বর্গ নরক placeও বটে stateও বটে।

বঙ্কিমচন্দ্র মানবজাতির জন্য অতি সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি গুরুর মুখে বলিয়াছেন—

যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম একত্র হইবে, সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।

শিষ্য। মানুষের অদৃষ্টে কি এমন দিন ঘটিবে?

গুরু। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। দুইই তোমাদের হাতে। এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্তা ও নেতা হইতে পার।

বিশেষতঃ হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

গুরু। কিন্তু তুমি দেখিবে, শীঘ্রই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া ক্রম্‌ওয়েলের সমকালিক ইংরেজের মত বা মহম্মদের সমকালিক আরবের মত অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিবে।

শিষ্য। কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি।

মানবের নিয়তি সম্পর্কে আমি অন্যত্র যাহা লিখিয়াছি, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি :—

উন্নতিই বিশ্বের নিয়ম—Progress is undoubtedly the law of life। কিন্তু প্রথম প্রথম ঐ উন্নতি অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়। প্রথমতঃ Arithmetical Progression—তারপর Geometrical Progression. Later still, the meandering stream, when nearing the sun-lit sea, will turn into a mighty torrent, so that in the closing stages of humanity progress will mount up by 'Powers'। কিন্তু শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, দ্রুতই হউক বা মন্থরই হউক, মানব একদিন না একদিন উন্নতির তুঙ্গ তোরণে আরূঢ় হইবে—and shall become that which entereth not the imagination—'Verily unto Him shall I return!'

ইহাকেই এদেশে বলে ব্রহ্মসাযুজ্য—গীতা যাহাকে বলিয়াছেন—'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ'.। যাঁহারা 'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ', অর্থাৎ যাঁহাদের ব্রহ্ম-ধর্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দভাব সুবিকশিত, যাঁহাদের প্রতাপ প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত—তাঁহারা, গীতার কথায়, সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।

ইহাই মনুষ্যের নিয়তি। অতএব মানবের ভবিষ্যৎ খুব সমুজ্জ্বল বটে!

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার মূল কথা এখানে শেষ করিলাম। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক মতের সবিশেষ আলোচনা করিতে হইবে। সে আলোচনা আগামী খণ্ডে আরম্ভ করিব।



প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

কোঁতের দৃষ্টবাদ (Positivism)

বঙ্কিমচন্দ্রের কিশোর বয়সে কোঁৎ (Auguste Comte)-এর Positivism (দৃষ্টবাদ) বঙ্গদেশে বেশ প্রসারলাভ করিয়াছিল। কি সূত্রে কাহার মারফৎ ঐ মতবাদ প্রথম এ প্রদেশে আনীত হয়—বাংলার দর্শনালোচনার ইতিহাসে উহা একটি স্মরণীয় ঘটনা; কিন্তু তাহা আমার ইতিহাস-জ্ঞানের সংকীর্ণ গণ্ডীর বহির্ভূত। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বয়সে তিনি যে ঐ Positivism বা দৃষ্টবাদ দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ।* এমন কি তাঁহার প্রবীণ বয়সের উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী'র মুখবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কোঁতের

---

* এ সম্পর্কে 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ভাগ, 'সাংখ্য দর্শন' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, কমলাকান্তের দপ্তর' প্রথম সংখ্যা, 'কমলাকান্তের পত্র' প্রথম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৮১, পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ্ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'কোমৎ দর্শন' সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধের আরম্ভ এই:—'কোম্‌ত দর্শন লইয়া এক্ষণে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য সমাজে অনেক আন্দোলন চলিতেছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের এক বিশিষ্ট সুহৃৎ ছিলেন খিদিরপুরের প্রখ্যাত Positivist যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার সহিত পরিচয়ের আমার সুযোগ ঘটিয়াছিল। দেখিয়াছিলাম ইনি শেষ অবধি Positivist মতবাদে অবিচলিত ছিলেন।

'Catechism of Positive Religion' হইতে নিম্নোক্তিটি সমাদরের সহিত উদ্ধৃত করিয়াছেন—"The general law of Man's progress, whatever the point of view chosen, consists in this that Man becomes more and more religious" এবং 'ধর্মতত্ত্বের' কয়েকস্থলে নিজ মত সমর্থনের জন্য কোঁতের অভিমতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ১২৯২, ফাল্গুনের 'প্রচারে' লিখিয়াছিলেন—

"চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্মেরই সার, এমত নহে—ইহা সকল ধর্মের সার। ইহা হিন্দুধর্মের সার, খৃষ্টধর্মের সার, বৌদ্ধধর্মের সার, ইসলামধর্মের সার, নিরীশ্বর কোমৎ-ধর্মেরও সার। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ হিন্দু, শ্রেষ্ঠ খৃষ্টিয়ান, শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ, শ্রেষ্ঠ মুসলমান, শ্রেষ্ঠ পজিটীভিষ্ট।"

অধিকন্তু সমাজের শিক্ষকরূপে কোঁৎকে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যুচ্চ বেদিতে স্থাপন করিয়াছেন

'রাজার অপেক্ষাও যাঁহারা সমাজের শিক্ষক তাঁহারা ভক্তির পাত্র। * * * রাজগণ ইঁহাদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তবে সমাজ শাসনে সক্ষম হয়েন। এই হিসাবে ভারতবর্ষ ভারতীয় ঋষিদিগের সৃষ্টি---এইজন্য ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, গৌতম,---সমস্ত ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ পিতৃগণস্বরূপ। ইউরোপেরও গলিলীও, নিউটন্, কান্ত্, কোমৎ, দান্তে, সেক্সপীয়র প্রভৃতি সেই স্থানে।'

কোঁতের Positivism-এর সার কথা কি? কোঁতের মতে মানবের চিন্তাধারা পর পর তিনটি 'ক্রম' পার হইয়া অগ্রসর হইয়াছে—আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক। 'In his opinion, the

progress of human knowledge passed through three stages,---the theological, the philosophical and the 'positive' or scientific ।* প্রথম বা আধিদৈবিক 'ক্রমে', মানুষ প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারের পশ্চাতে তাহার কারণ স্বরূপ দেবদেবীর কল্পনা করে---'regards all effects as the productions of supernatural agents.'

দ্বিতীয় বা আধ্যাত্মিক 'ক্রমে', ঐ সকল দেবদেবী অ-দৃষ্ট প্রতীকে পরিণত হইয়া ("The supernatural agents give place to abstract forces, personified abstractions') ধর্ম ও দর্শনের সাংকর্য সৃষ্টি করে।†

তৃতীয় বা আধিভৌতিক ক্রমই বৈজ্ঞানিক 'ক্রম'। এই 'ক্রমে' কার্যকারণের সুশৃঙ্খলা (the invariable relations of succession and similitude) সাব্যস্ত হইয়া মানবচিন্তা দৃষ্টবাদের (Positivism-এর) তুঙ্গ চূড়ায় সুস্থিত হয়।

কোঁতের সাক্ষাৎশিষ্য লুইস্ (George Henry Lewis) গুরুর ঐ ত্রি-ক্রম-বাদ এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন :—

Every branch of knowledge passes successively through three stages—1st, the *supernatural* or ficti-

* An Outline of Modern Knowledge (Gollancz), p. 65.

† ২।২০ 'গীতাভাষ্যে' বঙ্কিমচন্দ্র কোঁতের এ মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই :—প্রাচীনকালে সকল দেশে, দর্শন ধর্মের স্থান অধিকার করে এবং ধর্ম দর্শনের অনুগামী হয়। ইহা উভয়েরই অনিষ্টকারী। ধর্ম দর্শন পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইলেই উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না। এই তত্ত্বটি সপ্রমাণ করিয়া কোম্‌ৎ ও তৎশিষ্যগণ দর্শন ও ধর্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন। আমাদিগেরও সেই মার্গাবলম্বী হওয়া উচিত।

tious ; 2nd, the *metaphysical* or abstract ; 3rd, the *positive* or scientific. * * In the *supernatural* stage the mind seeks after causes ; aspires to know the *essences* of things and their modes of operation. It regards all effects as the productions of supernatural agents, whose operation is the *cause* of all the apparent anomalies and irregularities. Nature is animated by super-human beings. * * In the metaphysical stage, the supernatural agents give place to abstract forces (personified abstractions) supposed to inhere in the various substances, and capable themselves of engendering phenomena. In the positive stage, the mind, convinced of the *futility* of all inquiry into causes and essences, applies itself to the observation and classification of laws which regulate effects ; that is to say, the invariable relations of succession and similitude, which all things bear to each other.

অতএব কোঁতের মতে অধ্যাত্ম-চর্চা একেবারেই নিষ্ফল—শুধু নিষ্ফল নয়, নিরর্থক—যেহেতু Positivism treats experience (অনুভূতি) as the *only* source of knowledge and is consequently opposed to all metaphysical speculation' (See 'Outline' p. 546)। অতএব ধর্ম নয়, দর্শন নয়—বিজ্ঞানই মানুষের উপজীব্য। কোঁতের মতে ঐ বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ :—

He classifies the sciences in the order of their development, proceeding from the simpler to the more complex—mathematics, astronomy, physics, chemistry, biology and sociology.—The Modern Cyclopedia, Vol. VI, p. 507.

বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' কোঁতের এই বিদ্যাবিভাগ মোটের উপর অনুমোদন করিয়াছেন কিন্তু তিনি বিজ্ঞানের উপর 'প্রজ্ঞান' যোগ করিয়াছেন। গীতা বলেন—তাহাই প্রকৃষ্ট প্রকৃত জ্ঞান—যদ্দ্বারা —যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি (৪।৩৫)—ভূত, অহং ও ঈশ্বরকে জানা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

'ভূতকে জানিবে কোন শাস্ত্রে? বহির্বিজ্ঞানে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্‌তের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry—গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তারপর আপনাকে জানিবে কোন শাস্ত্রে? বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্বিজ্ঞানে অর্থাৎ কোম্‌তের শেষ দুই—Biology ও Sociology; এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচ্ঞা করিবে।

তারপর ঈশ্বর জানিবে কিসে? হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।'

কোঁৎ বিজ্ঞানকে যে উচ্চ কোঠায় স্থাপন করিয়াছেন, পরবর্তী বৈজ্ঞানিক অনেকে তাহার অনুমোদন করেন না। তাঁহাদের মতের উল্লেখ করিয়া 'Outline of Modern Knowledge'-এর গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

There is also grave difference of opinion among students of natural science concerning the status of scientific knowledge. It is maintained by many that science can *never* be more than an abstract and descriptive series of formulas. There is therefore a need for philosophy in some deeper sense than a synthesis of the results of science, which was the humble role assigned to it by Comte.

তবেই 'বিজ্ঞান' পর্য্যাপ্ত নয়—'দর্শন' চাই।

সে যাহা হ'ক, দেখা যায় কোঁৎ ঈশ্বরতত্ত্বে অবিশ্বাসী বটেন, কিন্তু ধর্মের প্রতি পক্ষপাতী। অর্থাৎ 'he had respect for religion but distrust of theology'। এ সম্পর্কে কোঁতের নিজের উক্তি এই :—

Religion in itself expresses the state of perfect *unity* which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge towards one common purpose। অর্থাৎ, Religion consists in regulating one's individual nature, and forms the rallying point for all the separate individuals.

অর্থাৎ ধর্ম চাই কিন্তু ঈশ্বর নাই। উপায় ?

After doing away with theology and metaphysics, and reposing his system on science or positive know-

ledge alone, Comte discovered that there was something positive in man's craving for a being to worship.

—Modern Cyclopedia p. 508.

সেইজন্য কোঁৎ ঈশ্বরের স্থলে 'মানব-দেবীর পূজা' (The Cultus of Humanity) প্রবর্তিত করিতে চাহিলেন।

"He therefore had recourse to what he calls the 'cultus of humanity', considered as a corporate being in the past, present and future, which is spoken of as the *Grand Etre.*

* * Yet the religious impluses of mankind were of the first importance and essential to social progreess. He proposed therefore as a substitute for Deity the *Grand Etre*, Humanity, as the object of devotion and worship. Let us transfer the religious emotions from the Deity of the traditional religions to the conception of Humanity as a whole."

এ সম্পর্কে 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ লিখিয়াছেন---

"সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান্ হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোমৎ 'মানবদেবীর' পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এবিষয়ে আর বেশী বলিবার নাই।"

তাই কি? কিছুই কি বলিবার নাই? আছে বলিয়াই ঐ

'Outline'-এর লেখক 'মানবদেবীর' পূজার প্রতি কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন---

The idea of humanity as an object of worship opens up insoluble difficulties. Humanity, as we know it, does not appear worthy of worship, and if we amend our creed to indicate that we worship *idealised* humanity, we are confronted with the somewhat remarkable demand that we should worship what, in the theory of Positivism itself, does not exist and is, moreover, incapable of being adequately described.

অতএব ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ধর্মস্থাপন অনেকটা শূন্যে গন্ধর্বনগর রচনের অনুরূপ 'অঘটনঘটন'। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরের সহিত সম্পর্কহীন ধর্মে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিয়াছেন ঈশ্বরভক্তিই ধর্মের সারাৎসার। তাঁহার মতে ভক্তি মনুষ্যের সেই উন্নততম অবস্থা---যখন তাহার সকল বৃত্তিগুলি ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তিনী হয়। অর্থাৎ 'ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব'। তিনি লিখিয়াছেন 'ধর্ম ঐশ নিয়মাধীন' এবং বলিয়াছেন যে, জ্ঞান উপাদেয় এই জন্য যে, জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না, ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করা যায় না।

সত্য বটে, কোঁৎ বলিতেন, 'শিক্ষা ধর্মের অংশ'। বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়াছেন নিরীশ্বর কোঁৎ-ধর্ম অনুশীলনের অনুষ্ঠান পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আদরের 'মটো' ছিল ধর্মের সার কর্ষণ, অনুশীলন—The substance of religion is culture। কিন্তু তাঁহার অনুমোদিত সেশ্বর অনুশীলনতত্ত্ব ও দৃষ্টবাদী কোঁতের

নিরীশ্বর অনুশীলনতত্ত্বে আকাশ পাতাল প্রভেদ। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বে এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন---

'বিলাতী অনুশীলনতত্ত্ব নিরীশ্বর—এইজন্য উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত--অথবা উহা অসম্পূর্ণ বা অপরিণিত বলিয়াই নিরীশ্বর,—ঠিক সেটা বুঝি না। কিন্তু হিন্দুরা পরম ভক্ত, তাহাদিগের অনুশীলনতত্ত্ব জগদীশ্বরের পাদপদ্মেই সমর্পিত।'

অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বর ভিন্ন ধর্ম নাই এবং 'ধর্মতত্ত্ব' প্রচারের কিছুদিন পূর্বে 'Ninenteeth Century'তে হার্বার্ট স্পেন্‌সর্‌ কোঁতের মত-প্রতিবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন ('Inscrutable Power in Nature') —যাহা মর্মতঃ বেদান্তের অদ্বৈতবাদের প্রতিধ্বনি – বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে সাদরে ধর্মতত্ত্বে স্থান দিয়াছেন।

ইহাও বক্তব্য, 'মানব-দেবী'র পূজার বিধান থাকিলেও কোঁৎ-ধর্ম নীরস। বঙ্কিমচন্দ্র 'ভালবাসার অত্যাচার' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

'কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ হিতবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ (আমি যাহাকে 'দৃষ্টবাদ' বলিতেছি)। এতদুভয়ের বেগে মনুষ্যহৃদয়-সাগরের অনল্পভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে।'

যাইবারই কথা। যে বাদে সেই রসামৃতসিন্ধুর বিন্দুমাত্র নাই —তাহা ত' নীরস হইবেই হইবে।

কোঁতের মতে প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান ব্যতীত প্রমাণান্তর নাই। ঈশ্বর খুব সম্ভব কাল্পনিক—যদিই বা না হন, তিনি যখন অ-দৃষ্ট, তখন অবশ্যই দৃষ্টবাদীর পরিত্যাজ্য।

এক সময় বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণ সম্পর্কে অনুরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'জ্ঞান' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন—'অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, সকল প্রমাণের মূল।' পরে যখন 'বিবিধ প্রবন্ধে' সংকলিত হইয়া ঐ 'জ্ঞান' প্রবন্ধ পুনঃ প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র পাদটীকায় লিখিলেন—'এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি' এবং 'ধর্মতত্ত্বে' পাঠককে সতর্ক করিলেন—'সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে। ইহা ভগবদ্‌গীতার টীকায় বুঝান গিয়াছে—পুনরুক্তি অনাবশ্যক'।

কোনও কোনও দার্শনিকের মতে আমাদের যে আত্মা বা অহংতত্ত্ব, তাহা কখনও জ্ঞানের গোচর হয় না—হইতে পারে না। ভগবদ্‌গীতার টীকায় বঙ্কিমচন্দ্র ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—'চিত্তবৃত্তিসকল সম্যক্ মার্জিত হইলে আত্মসম্বন্ধীয় এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয়।' এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বরও যোগশুদ্ধ চিত্তের প্রত্যক্ষ হন। 'দেবী চৌধুরাণী'তে দেবীর মুখ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন—

দেবী।—চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত-পদাদি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়—আর ইন্দ্রিয়াধিপতি মনঃ উভয়েন্দ্রিয়। * * মনের দ্বারাও প্রত্যক্ষ আছে—ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে। ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের বিষয়।

নিশি।—'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ' (সাংখ্যসূত্র)

প্রফুল্ল।—সূত্রকারস্ত উভয়েন্দ্রিয়-শূন্যত্বাৎ—ন তু প্রমাণাভাবাৎ * * চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়—রূপ, বহির্বিষয়; মানস প্রত্যক্ষের বিষয়—অন্তর্বিষয়। মনের দ্বারা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইতে পারেন।

সেই প্রাচীন কথা—

দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ—কঠ উপনিষদ্

অতএব দেখা গেল হার্বার্ট স্পেন্সরের অজ্ঞেয়বাদ (Agnosticism) —যাহা বলে ঈশ্বর অজ্ঞেয় অমেয় অচিন্ত্য অতর্ক্য—বঙ্কিমচন্দ্র ইহার অনুমোদন করেন না। বস্তুতঃ, শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্টের ভাষায়,—Man, being divine in essence, *can* know God.' তবেই বঙ্কিমচন্দ্র Agnostic নন, Gnostic.

আমরা জানিয়াছি, কোঁতের কাছে প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভিন্ন প্রমাণান্তর নাই—অর্থাৎ কোঁৎ আপ্তবাক্য বা আগমের প্রামাণ্য মানিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের কি মত ?

আমরা দেখিয়াছি—'ঈশ্বর জানিব কিসে ?' এ প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—'হিন্দু শাস্ত্রে—উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়'। এই সকল হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিদিগকে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ সমাদর করিতেন। তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' লিখিয়াছেন—

'প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্য্যাদা বা অনাদর করিবে না। * * আমিও সেই আর্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্বক, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি।'

ভগবদ্গীতার টীকায় বঙ্কিমচন্দ্র স্থানে স্থানে গীতোক্তিকে ভগবদ্-উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।* ভগবদ্গীতা তাঁহার দৃষ্টিতে চরম আগম। গীতা এক্ষণে আমরা যে শ্লোকাকারে পাই, উহাই যে ভগবানের মুখকমল-নিঃসৃত, বঙ্কিমচন্দ্র এরূপ মনে করিতেন না; কিন্তু গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য যে ভগবদ্-উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন।

---

* ৩।১৬ ও ৩।৩৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

কেহ কেহ অনুমান করেন, বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম কোঁৎ-ধর্মেরই পূর্ব্বরূপ—অর্থাৎ, বুদ্ধদেবও দৃষ্টবাদী ছিলেন। এ অনুমান ভিত্তিহীন। যে বুদ্ধদেব বলিতেন---দৃষ্টের চেয়ে অ-দৃষ্ট অনেক বড় ('The unseen things are more')--যিনি চর্মচক্ষুর পশ্চাতে দৈব চক্ষুঃ মানিতেন (The superhuman celestial seeing)---যে বুদ্ধদেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই 'জাত ভূত কৃত সংখত' বিশ্বের পশ্চাতে এক 'অজাত অভূত অকৃত অসংখত (unborn, uncreate, unbecome, unevolved) শাশ্বত সত্তা বিদ্যমান আছে—তাঁহাকে দৃষ্টবাদী বলা খুব সাহসিকতা নয় কি?

সে যাহা হ'ক, একথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, বঙ্কিমচন্দ্র কোঁতের যথেষ্ট অনুরাগী হইলেও 'দৃষ্টবাদী' ছিলেন না। আগামী অধ্যায়ে আমরা হিতবাদের আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেন্থামের হিতবাদ

যাহাকে 'Utilitarianism' বা 'হিতবাদ' বলা হয়, পাশ্চাত্যে তাহার প্রবর্তক জেরিমি বেন্থাম্। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'বেন্থাম্ হিতবাদ-দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।'

'The name 'Utilitarianism' is especially applied to the School founded by Jeremy Bentham'.

সে জন্য এ মতবাদকে কেহ কেহ 'Benthamism' বলেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বেন্থামের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Principles of Morals and Legislation' এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'Introduction to the Principles of Morals and Legislation' প্রকাশিত হয়। উভয় গ্রন্থের অন্তরালে (১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে) ডাঃ পেলি (Dr Paley, D. D.) তাঁহার 'Principles of Moral and Political Philosophy' প্রকাশ করেন। পেলির মতেরও দার্শনিক ভিত্তি ঐ হিতবাদ—

His system of Moral Philosophy is founded purely on Utilitarianism.—Modern Cyclopedia.

বেন্থামের প্রধান শিষ্য জন্ ষ্টুয়র্ট মিল্ (John Stuart Mill)। তাঁহার বাহনে 'হিতবাদ' সবিশেষ প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করে।* এ সম্পর্কে 'Outline'-এর গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

---

* ১৮৬২ অব্দে মিলের প্রখ্যাত গ্রন্থ 'Utilitarianism' প্রকাশিত হয়।

Benthamism was indeed and remained for the rest of the (nineteenth) century, the most powerful influence on English political thought and action.†

Utilitarianism বা হিতবাদের সার কথা কি? হিতবাদী বলেন সুখই জীবের কাম্য—'Pleasure is the ultimate end of every rational being'। হিতবাদের কথা এই যে, তাহাই বিধেয়, যদ্দ্বারা বহুজনের বহুল হিত (greatest good of the greatest number) সাধিত হয়; এবং তাহাই হেয়, যদ্দ্বারা বহুজনের বহুল অহিত সংঘটিত হয়। এখানে হিত (good)-অর্থে সুখ (Pleasure বা Happiness)—কল্যাণ বা Welbeing নয়।

'Utilitarianism postulates as the end of Ethics and Politics the greatest happiness of ths greatest number * * and maintains that increase of happiness ought to be the sole object of the moralist and legislator—pleasure and pain being the sole test of actions'। সেই জন্য অধ্যাপক সিজবিক্ (Henry sidgwick) হিতবাদকে Universalistic Hedonism (সমষ্টি-গত সুখবাদ) বলিয়াছেন।*

এক কথায়, হিতবাদীর মতে সুখ-দুঃখই ধর্মাধর্মের একমাত্র কষ্টিপাথর। The first principle of Utilitarianism is "that actions are right and wrong in proportion as they tend to promote happiness. * * By happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by unhappiness,

---

† An Outline of Modern Knowledge (Gallancz), p 716.

* Henry Sedgwick's The Methods of Ethics, 3rd Edition p 407.

pain and the privation of pleasure."—Mill's Utilitarianism, p. 9, etc.

ব্যাবহারিক জগতে এই মূল সূত্রের কিরূপ প্রয়োগ করিতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

'যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে একজনের হিতসাধন ধর্ম আবার একজনের হিতসাধন অপেক্ষা দশজনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্ম। যদি এক দিকে একজনের হিতসাধন ও আর এক দিকে দশজনের তুল্য হিতসাধন পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম হয়, তবে একজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশজনের তুল্য হিতসাধনই ধর্ম, এবং দশজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া একজনের তুল্য হিতসাধন করা অধর্ম। এখানে "Good of the *greatest number*"।

'পক্ষান্তরে যেখানে একজনের অল্প হিত, আর একদিকে আর একজনের বেশী হিত পরস্পর বিরোধী, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়া বেশী হিত সাধন করাই ধর্ম, তদ্বিপরীতই অধর্ম। এখানে কথাটা "greatest *good*"।'—ধর্মতত্ত্ব, একবিংশ অধ্যায়।

'হিতবাদ' এ দেশের পক্ষে নূতন কথা নহে—আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে আমরা বুদ্ধদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম—'বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায়'। তৎপূর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম, যাহাতে লোকের হিত তাহাই সত্য। যাহা তদ্-বিরুদ্ধ, তাহা অসত্য, তাহা অধর্ম।* গীতাতেও পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাই—'সর্বভূত-হিতে রতাঃ।'

* বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ। এ প্রসঙ্গে 'যদ্দ্বারা প্রাণিগণের

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥—১২।৪
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥—৫।২৫

সে যাহা হ'ক—আমাদের লক্ষ্যের বিষয়, যখন বাংলার সাহিত্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের উদয় হইল, তখন এ দেশে পাশ্চাত্য হিতবাদের পূর্ণ প্রভাব। দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রও তদ্দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি 'বঙ্গদর্শনে' 'ভালবাসার অত্যাচার' প্রবন্ধে লিখিতেছেন—

'যেখানে সত্যলঙ্ঘনাপেক্ষা সত্যরক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিবে, না সত্য ভঙ্গ করিবে? * * আমরা এ তত্ত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না—কেন না, হিতবাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। স্থূল কথার উত্তর দিব। * * কিন্তু যখন এমন ঘটে যে, সত্যপালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্যভঙ্গে ততদূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে। দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট,

রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম' এই কৃষ্ণ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :–

"এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ। কথাটায় এখনকার Herbert Spencer, Bentham, Mill-ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ কোনপ্রকার অমত করিবেন না জানি। কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ, বড় Utilitarian রকমের ধর্ম! বড় Utilitarian রকম বটে, কিন্তু আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইয়াছি যে, ধর্মতত্ত্ব 'হিতবাদ' হইতে বিযুক্ত করা যায় না,—জগদীশ্বরের সার্বভৌমিকত্ব এবং সর্বময়তা হইতেই ইহাকে অনুমিত করিতে হয়। সঙ্কীর্ণ খৃষ্টধর্মের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম বলে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, 'হিতবাদ' সে ধর্মের প্রকৃত অংশ। এই কৃষ্ণবাক্য যথার্থ ধর্ম লক্ষণ।" ইহার পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন–'বেন্থামের কথা ইংলণ্ড শুনিল– কৃষ্ণের কথা ভারতবর্ষ শুনিবে না?'

সত্যভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্তজনিত জনসমাজে যে অনিষ্ট, তাহা রামের স্বাধিকারচ্যুতিতেই গুরুতর। উহা দস্যুতার রূপান্তর। অতএব এমত স্থলে দশরথ সত্য পালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন।'

এই হিতবাদের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপর শেষ জীবন পর্যন্ত ছিল।

আরও দেখা যায়, যুবাকালে বঙ্কিমচন্দ্র হিতবাদী জন ষ্টুয়র্ট্ মিলের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। মিলের মৃত্যু-সন ১৮৭৩। পর বৎসর তাঁহার Three Essays (Nature, the Utility of Religion and Theism) মুদ্রিত হয়। ইহার অল্পকাল পরেই বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ বৈশাখের 'বঙ্গদর্শনে' তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'মিল, ডার্বিন ও হিন্দুধর্ম' প্রকাশিত করেন। এমন কি, ১২৮৪ বৈশাখের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি?' প্রবন্ধ (যাহা পরবর্তী কালে সম্প্রসারিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব' রচনা করেন)—ঐ প্রবন্ধও মিলের 'Autobiography'-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল।

শেষ জীবনে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মিলের সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ উপন্যাস সীতারামের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন—

'হায়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া স্থইন্‌বার্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না!'

ঐ প্রসঙ্গে উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্পে বিমুগ্ধ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা অমর অক্ষরে খোদিত রাখা উচিত—

'পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের

মত হিন্দু ? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু ? আর এই প্রস্তরমূর্তি সকল যে খোদিয়াছিল, তারা কি হিন্দু ? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষৎ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক। এ সকলই হিন্দুর কীর্তি—এ পুতুল কোন ছার ! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।'

পাঠক জানেন, হিতবাদের উপর কার্‌লাইলের বেশ কোপদৃষ্টি ছিল—তিনি উহার উপর অনেক বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন। বঙ্কিম চন্দ্রও কমলাকান্তের মুখ দিয়া ইউটিলিটিকে 'উদর-দর্শন' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

কমলাকান্তের উদর-দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র এই :—

উদরের ত্রিবিধ পূর্তিই পরম পুরুষার্থ।

ষষ্ঠ সূত্র :—উদরপূর্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য।

ভাষ্য। উদাহরণ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা লোকের কাণে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্য জাতির হিতসাধন করিয়াছেন, এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য আসিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন। বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। অনেকে সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক ও পত্রাদি প্রণয়ন দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতেছেন। এ সকলে প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্তি অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভ হইতেছে।

সপ্তম সূত্র :—অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর।

ভাষ্য। এই শেষ সূত্রের দ্বারা হিতবাদ-দর্শন এবং উদর-দর্শনের একতা প্রতিপাদিত হইল।

ইহা ব্যঙ্গ মাত্র। 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—'হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। হিতবাদ ধর্ম—অধর্ম নহে'।

বস্তুতঃ হিতবাদের যাহাই দোষগুণ থাকুক—হিতবাদী স্বার্থপর নহেন, পরার্থপর। হিতবাদ ব্যষ্টির সুখ অন্বেষণ করে না—সমষ্টির করে। অতএব হিতবাদ 'Egoistic Hedonism' নহে, 'Universalistic Hedonism'.

The good man will take care that the pleasure realised is not his alone but includes that of others.—Bentham.

The standard is not the agent's own happiness, but the greatest amount of happiness *altogether.*—Mill's Utilitarianism, p. 16

হিতবাদের আদ্যাচার্য জেরিমি বেন্থাম সুখের জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না—তাঁহার দৃষ্টিতে সর্বজাতীয় সুখ তুল্যমূল্য—তা' সে রোষ্ট-বিফ-আস্বাদন-জনিত সুখই হ'ক আর হ্যামলেটের অভিনয়দর্শন-জনিত সুখই হ'ক।

One pleasure is just as good as another—বেন্থাম বলেন আমোদ যখন সমান, তখন কাব্যের ও পুস্-পিন খেলার একই দর।

'*Quantity* is the only standard of measuring difference among pleasures and there is no *qualitative* difference among them.'

এই মত লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধে' একটু মৃদু উপহাস করিয়াছেন। 'কাব্যেও চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্চ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়।

বরং অনেকেরই 'আইভেনো' অপেক্ষা এক বাজি শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়। তবে তাঁহাদের পক্ষে কাব্য হইতে শতরঞ্চ উৎকৃষ্ট বস্তু ? এবং স্কট কালিদাসাদি অপেক্ষা একজন পাকা খেলোয়াড় বড় লোক ?'

কার্যক্ষেত্রে হিতবাদী ঐ বিধির কিরূপ প্রয়োগ করেন, অধ্যাপক সিজবিক্ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন—

By 'Greatest Happiness' is meant the greatest possible surplus of pleasure over pain, the pain being conceived as balanced against an equal amount of pleasure, so that the two contrasted amounts annihilate each other for purposes of ethical calculation.

ব্যবহারে ঐরূপ নিক্তির তৌল সম্ভব কিনা বিচার্য। যদিই বা সম্ভব হয়—তথাপি কবির কাব্যকলায় যে আনন্দ, ধ্যানীর 'ঋতম্ভরা' প্রজ্ঞায় যে আনন্দ, স্বদেশ-প্রেমিকের প্রাণ-বলিদানে যে আনন্দ, বুদ্ধদেবের 'মহানিষ্ক্রমণে' যে আনন্দ, ক্রাইষ্টের বিশ্বহিত-ব্রতে আত্মাহুতিতে যে আনন্দ—সে আনন্দের সহিত জরাজীর্ণ কামুকের কামসেবার আনন্দ বা ব্যাধিদীর্ণ পেটুকের জিহ্বাতৃপ্তির আনন্দকে তুল্যমূল্য জ্ঞান করা বাতুলতা নহে কি ?

সেই জন্য বেন্থামের প্রধান শিষ্য মিল সুখের শ্রেণীবিভাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মিল বলেন, সুখে সুখে 'তর তম' আছে বৈকি —সকল সুখ সমজাতীয় নয়—সুখের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদ বিস্পষ্ট।

'Mill maintains that in addition to the *quantitative* differences of pleasure, there are *qualitative* differences among them. In the sphere of morals, we have to regard

quality as higher than, or superior to, *quantity*. When we find one pleasure is greater in *quantity* (পরিমাণে বৃহত্তর) but worse in *quality* (প্রকৃতিতে ইতর) than another, we should prefer the latter to the former'.

সুখের উচ্চনীচ নির্ধারণ পক্ষে মিল 'advises every person to refer to his *superior nature* or sense *of dignity* as man'। তাঁহার নিজের কথা এই :—

It is better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied—better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied.*

এ কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ অনুমোদন আছে। তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' লিখিয়াছেন—

ভক্তি ও জাগতিক প্রীতির সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্তু তাহা অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় না, সে অনুশীলনও কঠিন ও জ্ঞান-সাপেক্ষ।

অধিকন্তু তিনি বলেন, সুখ ত্রিবিধ—স্থায়ী, ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য, এবং ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ।

"শেষোক্ত সুখকে সুখ বলা অবিধেয়,—উহা দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। সুখ তবে, হয় যাহা স্থায়ী—নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে দুঃখশূন্য। আমি যখন বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম, তখন এই অর্থেই সুখ-শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই ব্যবহারই এই শব্দের যথার্থ

---

* বিষ্ঠা মাঝে কীট নড়ে, কর্দমে শূকর, ভাবে হেন সুখী নাই অবনী ভিতর!

—কুমুদনাথের 'কাব্যগুচ্ছ'

ব্যবহার; কেন না, যাহা বস্তুতঃ দুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহাকে ভ্রান্ত বা পশুবৃত্তিদিগের মতাবলম্বী হইয়া সুখের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। * * দুঃখ-পরিণাম সুখও দুঃখের প্রথমাবস্থা, নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে। * * অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ; যেরূপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব সুখই সেই কষ্টি-পাথর।"

ইহাই এ দেশের প্রাচীন শিক্ষা। গীতাকারও শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া সুখের সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক—এ বিবিধ ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন :—

অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥
বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাদ্ যৎতদ্ অগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্॥ ১৮।৩৬-৯

'অভ্যাসের ফলে যে সুখে চিত্ত রমিত হয় এবং দুঃখ অবসিত হয়—যে সুখ আরম্ভে বিষতুল্য এবং পরিণামে অমৃতোপম, যাহা আত্মবুদ্ধির প্রসাদজনিত—সেই সুখই সাত্ত্বিক সুখ।

'যে সুখ আরম্ভে অমৃতোপম এবং পরিণামে বিষতুল্য—যে সুখ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শে উৎপন্ন—তাহাই রাজসিক সুখ।

'আর যে সুখ আরম্ভে ও অবসানে আত্মার মোহজনক—যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উত্থিত—সেই সুখই তামসিক সুখ।'

এখানে আমরা সুখের প্রকৃতিগত প্রভেদ (Qualitative differ-

ence) জানিলাম। বলা বাহুল্য, সাত্ত্বিক সুখই জীবের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

প্রাচীন 'ব্যাস ভাষ্যে' একটি প্রাচীনতর শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং পরং সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়-সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম॥

'ইহলোকে যাহা কামসুখ এবং পরলোকে যাহা দিব্য পরম সুখ—তৃষ্ণাক্ষয়-সুখের তুলনায় তাহারা ১৬ ভাগের এক ভাগও নয়।'

ইহা সুখের পরিমাণগত (Quantitative difference) ভেদ-নির্দেশ। সুখের 'তর-তমে'র চরম বিবৃতি আমরা উপনিষদে প্রাপ্ত হই। উপনিষদে মুক্তির অবস্থাকে 'ভূমানন্দ' বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে ঐ ভূমানন্দের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশেষ সৌভাগ্যবান্ সমৃদ্ধিমান্ সকলের অধিপতি, সর্ববিধ মনুষ্যভোগে সম্পন্ন—তাহার যে সুখ, তাহাই মনুষ্য-লোকের চরম আনন্দ।

স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবতি অন্যেষাম্ অধিপতিঃ সর্বৈর্মানুষ্যকৈঃ ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ, স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

পিতৃলোকের যে আনন্দ, সে আনন্দ ঐ আনন্দের শতগুণ; গন্ধর্ব-লোকের যে আনন্দ, পিতৃলোকের আনন্দের তাহা শতগুণ; দেবলোকে কর্মদেবগণের যে আনন্দ, গন্ধর্বলোকের আনন্দের তাহা শতগুণ এবং আজানদেবগণের যে আনন্দ, কর্মদেবগণের আনন্দের তাহা আবার শতগুণ; প্রজাপতিলোকের যে আনন্দ, আজান-দেবগণের আনন্দের তাহা শতগুণ; কিন্তু ব্রহ্মলোকের যে আনন্দ, ঐ প্রজাপতিলোকের আনন্দ তাহার শতাংশের একাংশ মাত্র।

অথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দঃ—

ইহাই চরম আনন্দ, পরম আনন্দাঃ—যিনি শ্রোত্রিয়, অবৃজিন, অকামহত, তাঁহার আনন্দের ঐ পরিমাণ।

যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতঃ অথ এষ এব পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩৩

অর্থাৎ নির্বাণী বা জীবন্মুক্ত পুরুষের আনন্দের মাত্রা মানবীয় চরম আনন্দের দশলক্ষ কোটি গুণ (billion times)। সেই জন্য উপনিষৎ ইহাকে 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য' (acme of bliss) বলিয়াছেন। এই 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য'ই গীতার 'সুখম্ আত্যন্তিকম্'—

সুখম্ আত্যন্তিকং যত্তু বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্—গীতা

—ইহাই বুদ্ধদেবের 'বিপুলং সুখং'

পস্সে চ বিপুলং সুখং—ধম্মপদ, পকিণ্ণকবগ্গ

অর্থাৎ, 'যে সুখের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন'। ইহাই সুখ-তত্ত্বের চরম কথা।

ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন—'কেন একে দশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিবে? কেন কোটি লোকের হিতের জন্য এক লক্ষ লোকের অনিষ্ট করা হইবে?' বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—এ কথাব উত্তর হিতবাদী দিতে পারেন না—কারণ, এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক—যাহা ভারতবাসীই দিতে পারেন। সে উত্তর কি?

ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন---

ময়া ততম্ ইদং সর্বং জগদ্ অব্যক্তমূর্তিনা—গীতা

'তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্বভূতময়। কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নহে, সকলেই তিনি বিদ্যমান। সেইজন্য সর্বভূতে সমদৃষ্টি করিতে হইবে। সকল মনুষ্যকে না ভালবাসিলে তাঁহাকে ভালবাসা

হইল না।' (কারণ, 'from the immanence of God, the solidarity of Man follows as an inescapable corollary—for, we are all rooted in the one Life).

'যতক্ষণ না বুঝিব যে সর্ব লোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। অতএব নিয়ম—আত্মবৎ সর্বভূতেষু – সমস্ত জগৎকে আত্মবৎ প্রীতির আধার কর।'*—ধর্মতত্ত্ব, ২১ অধ্যায়।

সেইজন্য service-এর সার্থক নাম 'সেবা'—স ইব আ (সমস্তাৎ) স (তিনি) সর্বভূতাধিবাস—অতএব 'সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতাম্ উপেত—সমত্বম্ আরাধনম্ অচ্যুতস্য' (প্রহ্লাদোক্তি)।

বঙ্কিমচন্দ্র 'হিতবাদ' সম্পর্কে আর একটা গুরুতর কথা উৎথাপন করিয়াছেন—ধর্মতত্ত্বে হিতবাদের স্থান কোথায় ?

"হিতবাদীদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে সমস্ত ধর্মতত্ত্বটা এই হিতবাদ-মতের ভিতরই আছে। তাহা না হইয়া, ইহা ধর্মতত্ত্বের সামান্য অংশমাত্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার বিখ্যাত 'অনুশীলন তত্ত্বের' একটি কোণের

* এ সম্পর্কে ডাঃ পেলির অভিমত উল্লেখযোগ্য :—

Among those who maintain the utilitarian theory of morals is Paley, who holds that men ought to act so as to further the greatest possible happiness of the race, because God wills the happiness of men, and rewards and punishes them according to their actions, the divine commands being ascertained from Scripture and the light of nature. কিন্তু Bentham's utilitarianism is considerably different from Paley's. It was entirely dissociated from theology or Scripture.

কোণ মাত্র। তত্ত্বটা সত্যমূলক, কিন্তু ধর্মতত্ত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধর্ম ভক্তিতে, সর্বভূতে সমদৃষ্টিতে। সেই মহাশিখর হইতে যে সহস্র সহস্র নির্ঝরিণী নামিয়াছে—'হিতবাদ' তাহার একটি ক্ষুদ্রতম স্রোতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক—ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ ধর্ম—অধর্ম নহে।"

পুনশ্চ—"হিতবাদের এতটুকু বুঝাইবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝ যে, অনুশীলনে হিতবাদের স্থান কোথায়? প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যে। সর্বভূত সমান, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের হিত যেখানে পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে, সে স্থলে ওজন করিয়া বা অঙ্ক কশিয়া দেখিবে। অর্থাৎ 'greatest good of the greatest number' আমি যে অর্থে বুঝাইলাম তাহাই অবলম্বন করিবে।"

'হিতবাদ-সম্পর্কে' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ কথা এই—

"উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে 'যদ্দ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয় তাহাই ধর্ম'—আমরা যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দুধর্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। * *

"যদি কখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয় তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একত্র হইয়া 'নমো ভগবতে বাসুদেবায়' বলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া তদুপদিষ্ট এই লোকহিতাত্মক ধর্ম গ্রহণ করিব। তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধিত করিতে পারিব।"

হিতবাদের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করিলাম। আগামী কয়েক অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের সবিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব

(১)

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান তাঁহার 'ধর্মতত্ত্ব'। ঐ গ্রন্থের কিয়দংশ-মাত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে ১২৯৫ বঙ্গাব্দে উহা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া 'ধর্মতত্ত্ব—প্রথম ভাগ—অনুশীলন' নামে গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয়। 'প্রথম ভাগ' বলাতে অনুমান হয়, ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের আরও বক্তব্য ছিল—কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যে ১৩০০ সালে অকালে ৫৬ বৎসর বয়সে তাঁহার আয়ুঃসূর্য অস্তমিত হওয়াতে সে বক্তব্য বলা হয় নাই।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—(ঐ খণ্ডে মুদ্রিত) 'মনুষ্যত্ব কি' ইতি শীর্ষক প্রবন্ধ জন্ ষ্টুয়র্ট মিলের জীবন চরিতের আলোচনার ভগ্নাংশ মাত্র। 'ধর্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে যে অনুশীলন-ধর্ম বুঝাইয়াছি, তাহার বীজ ইহাতে আছে।' ঐ প্রবন্ধ ১২৮৪ আশ্বিনের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধের এক স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম, এবং যেমন সে সকলগুলি সম্যক্ মার্জিত ও উন্নত হইলে, স্বভাবতঃ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্য নহে—জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া। কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য,

জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মানব জীবনের উদ্দেশ্য।"

এ বীজ উত্তরকালে কিরূপে 'ধর্মতত্ত্বে' পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়াছিল, প্রতিভার বিকাশ-লক্ষ্য-কামীর পক্ষে তাহা আলোচনার বিষয়।

'ধর্মতত্ত্ব' গুরুশিষ্যের সংবাদ (Dialogue)-রূপে প্রপঞ্চিত। এ প্রণালীর কয়েকটা বিলক্ষণ ও বিস্পষ্ট সুবিধা আছে—প্রশ্নোত্তরছলে বক্তব্যের ইচ্ছামত সম্প্রসারণ করা যায় এবং শিষ্যের মুখে পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া গুরুর মুখে তাহার নিরাস দ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন করা যায়। বিশেষতঃ গুরুর আসনে যদি বঙ্কিমচন্দ্রের মত এক জন তত্ত্বজ্ঞ বহুদর্শী লিপিকুশল ব্যক্তি সমাসীন হন, তবে এ প্রণালীর প্রয়োগ সরস ও সর্বতোমুখ হইতে পারে—এই 'ধর্মতত্ত্ব' তাহার নিদর্শন। গ্রীক গুরু প্লেটোর Dialogues বিশ্ববিশ্রুত—গীতার কৃষ্ণার্জুন সংবাদেও এ প্রণালী অনেকটা অনুসৃত। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র ঐ দুই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম কি? 'নবজীবনে' প্রকাশিত 'ধর্ম-জিজ্ঞাসা' নিবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রচলিত ব্যবহারে 'ধর্ম' শব্দ নানার্থে প্রযুক্ত হয়—তাহাদের ইংরাজী প্রতিশব্দ Religion, Ethics, Virtue, Righteousness, Attribute (যেমন চুম্বকের ধর্ম লোহাকর্ষণ) ও Custom (যেমন কুলধর্ম)। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র Religion-অর্থে ধর্মশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। 'ধর্মশব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা Religion শব্দের অনুরূপ। ধর্ম=ধৃ+মন্ (ধ্রিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোকং বা)। এই জন্য আমি ধর্মকে religion শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।'

ঐ 'ধর্ম-জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে*—Religion (ধর্ম) বলিতে আমরা কি বুঝিব, তৎসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র নানা মুনির নানামত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সিলির একটি বাক্য ('The substance of religion is culture') এবং অগুস্ত্ কোঁৎ-এর অভিমত সমাদরের সহিত উদ্ধৃত করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন,—"যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিয়া থাকিতে পারেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।"

মনুষ্যের ধর্ম কি? 'শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির বিহিত অনুশীলনই মনুষ্যের ধর্ম। ইহাই মনুষ্যত্ব। * * যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্বাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি। * * সেই মনুষ্যত্বের উপাদান—আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা।'

মানুষের অভ্যন্তরে কতকগুলি শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। এই শক্তিসকলকে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' 'বৃত্তি' নাম দিয়াছেন। তিনি বলেন—মানুষের সমুদয় শক্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী। 'ধর্মতত্ত্বের' অন্যত্র গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন---

* পরে ঐ প্রবন্ধ 'ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলন' গ্রন্থের 'ক' ক্রোড়পত্ররূপে মুদ্রিত হইয়াছিল।

† 'Religion in itself expresses the state of perfect unity which is the distinctive work of man's existence, both as an individual and in society, —when all the constituent parts of his nature, moral and physcial, are made habitually to converge towards one common purpose'.

'দেখ, তোমার হাত পা গলা তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে—কিন্তু একেরও সর্বাঙ্গীন পরিণতি হয় নাই। এইরূপ আর আর সমস্ত শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই সর্বাঙ্গীন পরিণতি না হইলে, শারীরিক সর্বাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না, কেন না, ভগ্নাংশগুলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা। * * যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জানিবে। মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে---সেগুলিকে বৃত্তি বলা গিয়াছে। কতকগুলির কাজ জ্ঞানার্জন ও বিচার। কতকগুলির কাজ কার্যে প্রবৃত্তি দেওয়া,—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর কতকগুলির কাজ আনন্দের উপভোগ, সৌন্দর্যের হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্তবিনোদন।* এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই মানসিক সর্বাঙ্গীন পরিণতি।'

'ধর্মতত্ত্বে'র আর এক স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ লিখিয়াছেন---

'বৃত্তিগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) শারীরিক ও (২) মানসিক। মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে, কতকগুলি কাজ করে বা কার্যে প্রবৃত্তি দেয়; আর কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে না, কোন বিশেষ কার্যের প্রবর্তক নয়, কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যেগুলির উদ্দেশ্য জ্ঞান, সেগুলিকে 'জ্ঞানার্জনী' বলিব। যেগুলির প্রবর্তনায়

* এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র লিখিয়াছেন ঃ—যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্যাদির পর্যালোচনা করিয়া আমরা নির্মল ও অতুলনীয় আনন্দ অনুভূত করি, সেই সকলের নাম দিয়াছি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক্ অনুশীলনে সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন-অভাবে ধর্মের হানি হয়।

আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই বা হইতে পারি, সেগুলিকে 'কার্যকারিণী' বৃত্তি বলিব। আর যে গুলি কেবল আনন্দ অনুভূত করায়, সেগুলিকে আহ্লাদিনী বা 'চিত্তরঞ্জনা' বৃত্তি বলা যাউক। জ্ঞান, কর্ম, আনন্দ—এই ত্রিবিধ বৃত্তির ত্রিবিধ ফল।

বঙ্কিমচন্দ্র বৃত্তির চাতুর্বিধ্য প্রতিপন্ন করিলেন—এ মতে আপত্তি করিবার বিশেষ কিছু নাই। তবে আমার মনে হয় বৃত্তির বৈদান্তিক শ্রেণীবিভাগ আরও বিজ্ঞানসম্মত। বেদান্তে যাহাকে ভূতাত্মা বলে (পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের 'Soul')—সেই ভূতাত্মা একাধারে কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা; অর্থাৎ ঐ ভূতাত্মা হইতে যুগপৎ জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উৎসারিত হয়—স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ (উপনিষদ্)। ক্রিয়াশক্তির ফলে জীব কর্তা, ইচ্ছাশক্তির ফলে ভোক্তা এবং জ্ঞানশক্তির ফলে জ্ঞাতা। জ্ঞানশক্তির প্রকাশ ভাবনায়, ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ কামনায় এবং ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ চেষ্টনায়। ইহারাই পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের পরিচিত Cognition, Emotion and Conation—চলিত কথায় Thinking, Feeling, and Willing। বেদান্ত বলেন, চেষ্টনা বা Conation-এর প্রকাশ হয় অন্নময় কোশের (Physical Bodyর) সাহায্যে, কামনা বা Emotion-এর প্রকাশ হয় প্রাণময় কোশের (Astral Body-র) সাহায্যে, এবং ভাবনা বা Cognition-এর প্রকাশ হয় মনোময় কোশের (Mental Body-র সাহায্যে।

আর একটু নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, ভূতাত্মার উৎসারিত ঐ ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা হইতে প্রসৃত সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎশক্তিরই আভাষ (reflection)। অর্থাৎ, নিম্নতর গ্রামে (on a lower level) যাহা ক্রিয়াশক্তি

(Power of Action)—উচ্চতর গ্রামে (on a higher level) তাহাই সন্ধিনী ; নিম্নতর গ্রামে যাহা ইচ্ছাশক্তি (Power of Desire) —উচ্চতর গ্রামে তাহাই হ্লাদিনী ; এবং নিম্নতর গ্রামে যাহা জ্ঞানশক্তি (Power of Thought)—উচ্চতর গ্রামে তাহাই সম্বিৎ। ঐ সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তি যথাক্রমে প্রতাপ, প্রেম ও প্রজ্ঞার আকারে স্ফুরিত হয়। খৃষ্টানেরা ইহাদিগকে Life, Light ও Love বলেন। উহাদেরই পাশ্চাত্য সংজ্ঞা Power, Wisdom ও Bliss— বেদান্তের পরিচিত সৎ, চিৎ ও আনন্দ।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, আমাদের বৃত্তিগুলি (তা' তাহাদিগকে যে নামেই অভিহিত করা যাক না) নিরপেক্ষ নয়, পরস্পর-সাপেক্ষ। তাঁহার কথা এই :—

'সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন পরস্পরের অনুশীলন-সাপেক্ষ। কেবল শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সাপেক্ষ এমন নহে। কার্যকারিণী বৃত্তিগুলিও তৎসাপেক্ষ। * * শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন।'

বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেন যে, বৃত্তিগুলি কেবল স্ফূর্ত হইলেই হইল না—তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য চাই---যাহাকে বলে harmonious development। 'তাহা হইলেই বৃত্তিগুলির উচিত অনুশীলন ও পরিণতি ঘটিবে। ইহাই ধর্ম।' 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র একথা সবিশেষ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

অনুশীলন-নীতির স্থূল গ্রন্থি এই যে, সর্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য-বিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না।

পুনশ্চ—বৃত্তিসকলের অনুশীলনের স্থূল নিয়ম পরস্পরের সহিত

সামঞ্জস্য। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্তি ও পরিতৃপ্তি সুখ নহে—সুখের অংশ মাত্র—সমবায়ই সুখ।

অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংকর্ষিত করিতে হইবে।

'তাহা না হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগুলির স্ফূর্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী, কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্যগত-প্রাণ, সর্ব সৌন্দর্যের রসগ্রাহী—কিন্তু জগতের অপূর্ব বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে অজ্ঞ—সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন, সুতরাং ধর্মে পতিত।'

সেই জন্য যে মানবের সমস্ত বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত অথচ সমঞ্জস—বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তিনিই পূর্ণ মানুষ।

অর্থাৎ 'জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা—এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্বাঙ্গীন পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্বাঙ্গীন পরিণতি আছে। অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ এবং সর্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই।'

এ সম্পর্কে আপন বক্তব্যের সার সংগ্রহ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম। সেই অনুশীলনের সীমা—পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য। তাহাই সুখ।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন,

প্রস্ফূরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে সুদুর্লভ। তাঁহার মতে এইরূপ আদর্শ-মানব পৃথিবীতে এ পর্যন্ত একজন মাত্র দেখা গিয়াছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মানব নহেন, অতিমানব—অবতার। কিন্তু সে কথার এখানে আলোচনা করিব না।*

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন—মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম—ঐ ধর্মেই সুখ। সুখ কি? 'সুখ সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্তি, সামঞ্জস্য এবং চরিতার্থতা।' 'শারীরিক ও মানসিক শক্তি বা বৃত্তিসকলের অনুশীলনেই † সুখ—ইহা ভিন্ন অন্য সুখ নাই।' ইহাই ধর্ম। 'ধর্মই সুখের একমাত্র উপায়। ধর্ম নিত্য—ধর্ম ইহকালেও সুখপ্রদ, পরকালেও সুখপ্রদ। সুখের উপায় যদি ধর্ম হইল, তবে ইহকালের যে ধর্ম, পরকালেরও সেই ধর্ম।' অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—ধর্ম আত্মপীড়ন নহে, আপনার আনন্দবর্ধন। তাঁহার ঠিক কথাগুলি এই:—

ধর্মের মূর্তি বড় মনোহর। ঈশ্বর প্রজাপীড়ক নহেন—প্রজাপালক। ধর্ম আত্মপীড়ন নহে—আপনার উন্নতিসাধন; আপনার আনন্দবর্ধনই ধর্ম। ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি—এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল, তাহার মোহিনী মূর্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে কি আছে?—১২৯২ পৌষমাসের প্রচার।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সুখবাদী হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র 'Hedonist' ছিলেন না। এ সম্পর্কে গত অধ্যায়ে প্রকাশিত 'বেন্থামের

---

* পরবর্তী 'বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ' অধ্যায়ে এ বিষয়ের যথোচিত আলোচনা থাকিবে।

† লক্ষ্য করিতে হইবে, অনুশীলন ও অভ্যাস এক জিনিষ নহে—বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—'অনুশীলন শক্তির অনুকূল, অভ্যাস শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা।'

হিতবাদ' প্রবন্ধের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পাঠক ঐ প্রবন্ধে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সুখের শ্রেণীভেদ করিয়া বলিয়াছেন—সুখ ত্রিবিধ—স্থায়ী, ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য, এবং ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ। শেষোক্ত সুখ সুখই নয়, দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র যখন ধর্মকে সুখের উপায় বলিয়াছেন, তখন সুখ-শব্দ দ্বারা স্থায়ী অথবা পরিণামে দুঃখশূন্য সুখকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত অনুশীলন-ধর্মের উদ্দেশ্য ঐরূপ সুখ। অর্থাৎ, 'যেরূপ অনুশীলনে স্থায়ী সুখ বা দুঃখশূন্য সুখ জন্মে, তাহাই বিহিত। এইরূপ সুখই ধর্মের কষ্টিপাথর।' অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—'সুখের উপায় ধর্ম আর মনুষ্যত্বেই সুখ, অতএব সুখই সেই কষ্টিপাথর।'

বঙ্কিমচন্দ্র একথাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য অনুশীলন ধর্মের লক্ষ্য সুখমাত্র, কিন্তু তিনি যে ভারতীয় অনুশীলন-তত্ত্বের পুনঃ প্রচার করিয়াছেন,—যাহা তাঁহার মতে হিন্দুধর্মের সারাংশ এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ভগবদ্গীতা যে অনুশীলন-তত্ত্বের উপর গঠিত, সে অনুশীলন-তত্ত্বের উদ্দেশ্য মুক্তি। ঐ মুক্তি সুখমাত্র নহে—উহা আত্যন্তিক সুখ (গীতা), বিপুলং সুখং (ধম্মপদ) এবং উপনিষদের ভাষায় আনন্দং নন্দনাতীতম্। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভূমানন্দের (বৃহদারণ্যকে যাহাকে 'অতিঘ্নীম্ আনন্দশ্চ' বলা হইয়াছে) ইঙ্গিত করিয়াছেন—বিস্তার করেন নাই। অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় যে মোক্ষের আনন্দ অনুভূত হয়, অর্থাৎ নির্বাণী বা জীবন্মুক্ত পুরুষের যে আনন্দ, তাহা সকল বিষয়ে সৌভাগ্যবান্, সমস্ত সমৃদ্ধিমান্, সর্ববিধ মনুষ্যভোগে সম্পন্ন ব্যক্তির চরম আনন্দের দশ লক্ষ কোটি গুণ (billion times)।

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব

(২)

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মনুষ্যের অন্তর্নিহিত শারীরিকী ও মানসিকী বৃত্তিগুলির বিহিত অনুশীলনই মনুষ্যের ধর্ম। বৃত্তিগুলিকে তিনি শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী—এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ঐ বৃত্তিগুলি নিরপেক্ষ নয়—পরস্পর-সাপেক্ষ এবং তাঁহার মতে সকল বৃত্তিগুলিরই যুগপৎ অনুশীলন আবশ্যক এবং সেই অনুশীলনের সীমা বৃত্তিগুলির পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য। অর্থাৎ বৃত্তিগুলি স্ফূর্ত হইলেই হইল না—তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য চাই, কেহ যেন কাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়। ঐ 'Harmonious Development'-এর ফলে মানুষ আধখানা মানুষ নয়—পূর্ণ মানুষ হইবে। ঐ পূর্ণ মানুষই আদর্শ মানুষ—নতুবা সে মনুষ্যত্ববিহীন, সুতরাং ধর্মে পতিত। এই পূর্ণ মনুষ্য হইবার উপায় ও উপাদান—বৃত্তির যথাযথ অনুশীলন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'অনুশীলনের দ্বারা সকলেই ধার্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্মিক হইবে। অনুশীলনের পূর্ণ মাত্রায় মোক্ষ।' ঐ অনুশীলনের প্রণালী ও পদ্ধতি কি?

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কথা এই যে, শৈশবেই সমস্ত বৃত্তিগুলির এককালে যথাসাধ্য অনুশীলন আরম্ভ করিতে হইবে। অবশ্য—শিশুর জানা সম্ভব নয় কি প্রকারে কোন্ বৃত্তির অনুশীলন করিতে হয়। এজন্য উপযুক্ত শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক।

'শিক্ষক ও শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সকলেরই

শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। এইজন্য হিন্দুধর্মে গুরুর এত মান। আজ গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না।' (অষ্টম অধ্যায়)*

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—'আত্ম-রক্ষা, স্বজন রক্ষা, এবং স্বদেশ রক্ষার জন্য শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন সকলেরই কর্তব্য।' কেবল শারীরিক বল পর্যাপ্ত নয়—তৎসঙ্গে ব্যায়াম (মল্লযুদ্ধ ইহার অন্তর্গত) চাই; আর চাই অস্ত্রশিক্ষা এবং অশ্বারোহণ, সন্তরণ, পদব্রজে দূর গমন, এবং সর্বশেষ – সহিষ্ণুতা—শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা। এক কথায়, দক্ষ কর্মকার যেমন আপনার অস্ত্রখানিকে তীক্ষ্ণধার ও মার্জিত করিয়া সকল দ্রব্য-ছেদনের উপযোগী করে, দেহকে ব্যায়াম, শিক্ষা, আহার ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে—যেন তদ্দ্বারা সর্ব-কর্ম সিদ্ধ হয়। এসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ কথা এই :—'শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি এরূপ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট যে, একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের ব্যাঘাত ঘটে। অতএব যে সকল ধর্মোপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলন উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহাদের কথিত

* পরবর্তী দশম অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই গুরুর প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—'গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আমাদের জ্ঞানদাতা—এজন্য ভক্তির পাত্র। গুরু ভিন্ন মনুষ্যের মনুষ্যত্বই অসম্ভব। এজন্য গুরু বিশেষ প্রকারে ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্ম সর্বতত্ত্বদর্শী, এজন্য হিন্দুধর্মে গুরুভক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি।' প্রাচীন ভারতে ধর্মগুরু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার মতে তাঁহারা কতদূর ভক্তির পাত্র—'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র—মূল কথা' প্রবন্ধে এ কথার আলোচনা করিয়াছি।

ধর্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জন সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্মবিরুদ্ধ।'

জ্ঞানার্জনী বৃত্তির প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'জ্ঞানার্জন ধর্মের একটি প্রধান অংশ। জ্ঞানোপার্জন ভিন্ন অন্য বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করা যায় না—বিশেষতঃ জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না, ঈশ্বরের বিধিপূর্বক উপাসনা করা যায় না।' অতএব জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসকলের সম্যক্ স্ফূর্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। গীতা বলেন তাহাই জ্ঞান – যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি—যদ্দ্বারা সমস্ত ভূতকে আত্মাতে ও ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়। ভূতকে জানিতে হইবে বহির্বিজ্ঞানে অর্থাৎ Mathematics, Astronomy, Physics and Chemistry—গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়নে। আত্মাকে জানিতে হইবে বহির্বিজ্ঞানে ও অন্তর্বিজ্ঞানে অর্থাৎ Biology, Psychology and Sociology—জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানে। এবং ঈশ্বরকে জানিবে অধ্যাত্মবিজ্ঞানে—উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, গীতায়।

লক্ষ্য করিতে হয়, জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্রও হইতে পারে। (আমাদের দেশের প্রাচীনারা ইহার উত্তম উদাহরণস্থল—তাঁহারা কথকের মুখে অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার পুরাণ ইতিহাস শ্রবণ করিতেন; ফলে তাঁহাদিগের জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসকল পরিমার্জিত ও পরিতৃপ্ত হইত)। এমন কি জ্ঞানার্জন জন্য সর্বত্র পুস্তকপাঠও প্রয়োজনীয় নহে। তবে এ কথা ঠিক্, গ্রন্থাভ্যাস জ্ঞান বৃত্তি স্ফুরণের প্রধান সহায়। কারণ, 'গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ'।

জ্ঞানচর্চার মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনী বৃত্তির বিকাশ—অর্জিত জ্ঞান-স্তূপের চাপে শিক্ষার্থীর চিত্তকে ভারাক্রান্ত করা নহে। ইহাই প্রকৃত

শিক্ষা—অন্য শিক্ষা কুশিক্ষা। * কুশিক্ষার ফল— মানসিক অজীর্ণ, বৃত্তিসকলের অবনতি। অজীর্ণ জ্ঞান প্রকৃতই পীড়াদায়ক। জ্ঞান-পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি বস্তুতই কৃপাপাত্র—অর্জিত জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয়, যাহা যাহা জানিয়াছে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি, কিরূপে তাহা-দিগের সমবায় সিদ্ধ করিতে হয়—এ সকলের সে কিছুই জানে না। এক কথায় ঐরূপ জ্ঞান 'Head-learning' মাত্র—'Soul-wisdom' নহে।

আদর্শ শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সবিশেষ আলোচনা করেন নাই। বস্তুতঃ সে আলোচনা শিক্ষাতত্ত্বের (Science of Education-এর) বিষয়—ধর্মতত্ত্বের নহে। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, যে প্রণালীতে জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ—কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ—সে প্রণালী অনিষ্টকর। তাঁহার শেষ কথা এই—'ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য সমাজে গৃহীত হইলে এই কুশিক্ষারূপ পাপ সমাজ হইতে দূরীভূত হইবে।'

এইবার কার্যকারিণী বৃত্তির কথা বলি। হার্বার্ট স্পেন্‌সর্‌ ঠিকই বলিয়াছেন, জীবন-ব্যাপারে জ্ঞানার্জনী অপেক্ষা কার্যকারিণী বৃত্তির প্রভাব ও প্রসার অনেক অধিক—কারণ, দেখা যায়

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ

---

* এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর প্রতি বেশ রোষ-কটাক্ষ করিয়াছেন এবং ইহার কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। ইহার পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি—এখানে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

সেই সেণ্ট্ পলের কথা :—The good that I would do I do not; but the evil I would not, that I do. For I delight in the law of God but I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members, যেখানে জ্ঞানে ও ভাবে (Intellect ও Emotionএ) দ্বন্দ্ব, সেখানে ভাবেরই জয়, জ্ঞানের পরাজয়। সেইজন্য সোপেন্‌হওয়ার্ বলিতেন, মানুষের ব্যাধি Diseased Will—ব্যাধিত বুদ্ধি নয়।

আমরা দেখিয়াছি, যে বৃত্তির কাজ কর্মে প্রবৃত্তি দেওয়া—যথা, ভক্তি প্রীতি দয়া, কাম ক্রোধ লোভ—তাহারাই কার্যকারিণী বৃত্তি। ইংরাজিতে ইহাদিগের সার্থক নাম Emotion—E-motion, অর্থাৎ প্রেরণশীল। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' এ বিষয়ের প্রভূত আলোচনা করিয়াছেন—সে আলোচনা বেশ নিপুণ ও নিবিড়। তিনি প্রথমতঃ ভক্তির কথা বলিয়াছেন—পিতা মাতা স্বামী স্ত্রী রাজা আচার্য পুরোহিত লোকশিক্ষক জ্ঞানী ধার্মিক প্রভৃতিকে পাত্র করিয়া কিরূপে ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন করিতে হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়া ঈশ্বরই যে প্রকৃত ভক্তির আশ্রয় ও বিষয়, তাহা সুন্দর ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ তথ্যের প্রতিপাদনে তিনি 'ধর্মতত্ত্বে' পর পর দশটি অধ্যায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং ভগবদ্গীতা ও বিষ্ণুপুরাণের প্রহ্লাদ-চরিত্র অবলম্বন করিয়া অতি মনোরম ভাবে বক্তব্যের উপন্যাস করিয়াছেন। দর্শন-সাহিত্যে এরূপ উপাদেয় ব্যাখ্যান সুদুর্লভ। ঈশ্বর-ভক্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—'ঈশ্বর ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব—এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই ভক্তি'।

পুনশ্চ—

'মনুষ্যের বৃত্তিমাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরই মহৎ। ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য—অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম, অনন্ত সৌন্দর্য, অনন্ত শক্তি—অনন্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্য, তাহার অবরোধ কোথায়? ভক্তিশাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য।'

ভক্তির পরেই প্রীতি—কারণ, (বঙ্কিমচন্দ্রের মতে) বৃত্তির মধ্যে উৎকর্ষ-নিকর্ষ নির্দেশে এই দুইটি বৃত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ—ভক্তি ও প্রীতি। 'ঈশ্বরে ভক্তি ও মনুষ্যে প্রীতি ইহাই ধর্মের সার, অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুখের মূলীভূত এবং মনুষ্যত্বের চরম।' প্রীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি ও পশুপ্রীতি—এই চারি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক তাহা নিবিষ্টভাবে পাঠ করিতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন —সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি, কিন্তু তিনি আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন যে তাঁহার অনুমোদিত স্বদেশপ্রীতি ইউরোপীয় Patriotism নহে।

"ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism-ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরের সমাজে কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism-প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য-ধর্ম না লিখেন।"

প্রীতির কথা শেষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

'ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন; এইজন্য সর্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত,

এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।'

প্রীতির পর দয়া। আর্তের প্রতি যে বিশেষ প্রীতিভাব, তাহাই দয়া। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, অতএব সর্বভূতে দান করিবে। দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ। জলাশয় হইতে গণ্ডূষ জল তুলিয়া ধনকুবের অপরকে দিলে তাহা দান হইল না। আপনাকে কষ্ট দিয়া পরের উপকার করিলে, তাহাই দান। ঐরূপ দানের দ্বারাই দয়াবৃত্তির অনুশীলন হয়। যাহা ঈশ্বরের (আমরা ত' ন্যাসী মাত্র), তাহা ঈশ্বরকে দেয়; ঈশ্বরকে সর্বস্বদানই মনুষ্যত্বের চরম।

যাহাকে আমরা হিংসা বলি, তাহা ঐ প্রীতি ও দয়া বৃত্তির বিরোধী। সেজন্য এ দেশের প্রচলিত কথা এই—অহিংসা পরমো ধর্মঃ। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাত ধর্মতত্ত্বে অহিংসার স্থান কি? 'কৃষ্ণ-চরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। তাহার উত্তর এই :— 'অহিংসা পরম ধর্ম এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, ধর্ম-প্রয়োজন ভিন্ন যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম নহে; বরং পরম ধর্ম।' সেই জন্যই আদর্শ ধার্মিক শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন কশ্মলগ্রস্ত হইয়া কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিলে উপদেশ দিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর!
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহো করিষ্যে বচনং তব॥

অহিংসা ধর্মের এতদূর মর্মস্থানীয়, যে মহাভারতের কর্ণপর্বে দেখিতে পাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'বরং মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনই হিংসা বিহিত নহে।' এ বাক্যের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের টীকা এই :—

"কৃষ্ণের কথার ফল এই যে, যদি এমন অবস্থা কাহারও ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে, নয় নরহত্যা করিতে হইবে, তবে সে বরং মিথ্যা কথা বলিবে, তথাপি নরহত্যা করিবে না। যদি এরূপ ধর্মাত্মা নীতিজ্ঞ কেহ থাকেন যিনি বলেন যে, বরং নরহত্যা করিবে, তথাপি মিথ্যা কথা বলিবে না, তবে আমাদের উত্তর এই যে তাঁহার ধর্ম তাঁহাতেই থাক, এ নারকী ধর্ম যেন ভারতবর্ষে বিরল-প্রচার হয়।"

মনুষ্যের কতকগুলি নিকৃষ্ট বৃত্তি আছে—যথা কাম ক্রোধ লোভ—(বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদিগকে 'পাশব বৃত্তি' বলিয়াছেন), তৎসম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি? ঐ সকল পাশব বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত, অনুশীলন-সাপেক্ষ নহে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত, সংযম না করিলে তাহার অনুচিত স্ফূর্তি ঘটে। অতএব কামক্রোধাদির দমনই প্রকৃত অনুশীলন—কিন্তু ধ্বংস নয় নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। কামের ধ্বংসে মনুষ্যজাতির ধ্বংস ঘটিবে, সুতরাং ঐ কদর্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম নহে—অধর্ম। ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার মূল। দণ্ডনীতি বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ এবং দণ্ডনীতির উচ্ছেদে সমাজের উচ্ছেদ। এইরূপ লোভ—লোভ যতক্ষণ ধর্মসঙ্গত অর্জন-স্পৃহা, জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয়। অতএব তাহার ধ্বংস অনুচিত। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—'বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক (আমি কোন বৃত্তিকেই নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি) উচ্ছেদ মাত্রই অধর্ম। অনুচিত স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইলেই কামক্রোধাদি মহাপাপ হইয়া দাঁড়ায়—নতুবা নহে। অতএব এগুলি উচিত মাত্রায় ধর্ম—অনুচিত মাত্রায় অধর্ম। এবং যেহেতু ঐ বৃত্তিগুলি স্বভাবতঃ এমনই তেজস্বিনী যে, যত্ন না করিলে তাহারা সচরাচর উচিত মাত্রা অতিক্রম করে—অতএব দমনই তাহাদের প্রকৃত অনুশীলন।'

১২৯২ ফাল্গুনের 'প্রচারে' 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র ঐ কথা বলিয়াছেন :—

"চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সংযম। "ইন্দ্রিয়-সংযম" ইতি বাক্যের দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে, ইন্দ্রিয়সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিতে হইবে—কেবল ইহাই বুঝিতে হইবে। * * * স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের আসক্তির অভাবই ইন্দ্রিয়-সংযম। আত্মরক্ষার্থে অর্থাৎ ঐশিক নিয়মরক্ষার্থে যতটুকু ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত যে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির অভিলাষ করে তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হয় নাই ; যে না করে, তাহার হইয়াছে। যাহার ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে সুখ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, কেবল ধর্মরক্ষা আছে, তাহারই ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে।"

এ সকল কথায় বোধ হয় কাহারই আপত্তি হইবে না। তবে আমার মনে হয় শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট্ এ সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা আরও কল্যাণতর। তিনি বলেন, ধর্মজীবনে যাঁহারা অগ্রসর, তাঁহারা কামক্রোধাদি নিকৃষ্ট বৃত্তির উচ্ছেদ করেন না—তাহাদের উপাদেয় করেন—destroy করেন না, transmute করেন ; মারণ করেন না, জারণ করেন ; উন্মূলন করেন না—উত্তোলন করেন, sublimate করেন। এই প্রক্রিয়ার তিনি নাম দিয়াছেন আধ্যাত্মিক কিমিয়া (Spiritual Alchemy)। অ্যালকেমিষ্ট যেমন কৌশল দ্বারা তাম্র শিষা প্রভৃতি ইতর ধাতুকে সুবর্ণে রূপান্তরিত করে, সাধন পথে অগ্রসর সাধক সেইরূপ কামক্রোধাদি ইতর বৃত্তিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তিতে রূপান্তরিত করেন ইহাই তাঁহার যোগ-কৌশল—যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ (গীতা)।

Now, this process of spiritual alchemy may be regarded as a transmutation of forces. Each man has in himself life and energy and vigour, power of will and so on. By a process which may fairly be described as alchemical, he transmutes these forces from lower ends to higher; he transmutes them from gross energies to energies that are refined and spiritualised * * (At a certain stage of spiritual progress) he will begin deliberately to transmute those faculties of the lower nature and by this alchemical process refine them in the way at which I have hinted. * * A love that is selfish —how shall it be changed ? Not by diminishing the love, not by chilling it down and making it colder and harder as it were, but by encouraging the love and deliberately trying to eliminate those elements which degrade it; by watching the lower self, and when it begins to build a little wall of exclusion, knocking that wall down; when it desires to keep that which is so precious and so admirable, then at once trying to share with its neighbours; when it tries to draw the loved one from others, rather to give him out that he may be shared by others.

এইবার চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির কথা বলি। আমরা দেখিয়াছি, চিত্তরঞ্জিনী সেই বৃত্তি যেগুলি কেবল আনন্দ অনুভূত করায় অর্থাৎ 'যে

সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্যাদির পর্যালোচনা করিয়া আমরা নির্মল ও অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করি'—তাহারাই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'প্রকৃত ধার্মিক হইতে হইলে বুদ্ধ্যাদি জ্ঞানার্জনী বৃত্তির ও ভক্ত্যাদি বৃত্তির অনুশীলন যেমন প্রয়োজনীয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলনও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। ভগবান্ সচ্চিদানন্দ—তাঁহায় সৎভাবকে জানা যায় জ্ঞানের দ্বারা এবং চিৎভাবকে জানা যায় ধ্যানের দ্বারা। কিন্তু তাঁহার আনন্দ ভাব? সে ভাব চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিরই বেদ্য। 'ঐ বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনে এই সচ্চিদানন্দ জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। তদ্‌ব্যতীত ধর্ম অসম্পূর্ণ।'

'জগতের সকল ধর্মের একটি অসম্পূর্ণতা এই যে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন বিশেষরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু একথা ঠিক নয় যে, প্রাচীন ধর্মবেত্তারা এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন। হিন্দুর পূজায়—পুষ্প, চন্দন, মাল্য, ধূপ, দীপ, ধুনা, গুগ্‌গুল, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্য ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলনের সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন। গ্রীক্‌দিগের ধর্মে এবং মধ্যকালের ইউরোপীয় রোমীয় খৃষ্টধর্মে উপাসনার সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের স্ফূর্তির ও পরিতৃপ্তির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আপিলীস্ বা রাফেলের চিত্র, মাইকেল এঞ্জিলো বা ফিদিয়সের ভাস্কর্য, জার্মানির বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেতৃগণের সঙ্গীত উপাসনার সহায় হইয়াছিল। চিত্রকরের, ভাস্করের, স্থপতির, সঙ্গীতকারকের সকল বিদ্যা ধর্মের পদে উৎসর্গ করা হইত। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত উপাসনার সহায় ছিল।

চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি কিরূপে অনুশীলিত করিতে হইবে? বঙ্কিমচন্দ্র বলেন :—

'জাগতিক সৌন্দর্যে চিত্তকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। জগৎ সৌন্দর্যময়। বহিঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্যময়, অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্যময়। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বশবর্তী হইয়া সৌন্দর্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইতে থাকিলে, ক্রমে, অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যানুভবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্যের আভাস পাইতে থাকিবে।'

'নৈসর্গিক সৌন্দর্যের উপর চিত্তস্থাপনই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের একমাত্র উপায় নহে। মনুষ্যের চেষ্টায় ঐ অনুশীলনের সাহায্যকারী বিশেষ বিশেষ বিদ্যা উদ্ভূত হইয়াছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য—এ সকল সেই অনুশীলনের প্রকৃষ্ট সহায়, কিন্তু কাব্যই এ বিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায়। কাব্যদ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রেমিক হয়। এইজন্য কবি ধর্মের একজন প্রধান সহায়। রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য কাব্যগ্রন্থ আর নাই;—অথচ ইহাই হিন্দুদিগের এক্ষণে প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য আছে যে অন্যদেশে তাহা অতুলনীয়।'

ঈশ্বর অনন্ত সুন্দর। তিনি একাধারে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ (গ্রীক্‌রা যাহাকে বলিতেন The True, The Good and The Beautiful)। বিশ্বের মধ্যে যে কিছু সৌন্দর্য লক্ষিত হয়, সে সকলের অফুরন্ত উৎস সেই চিরসুন্দর। অতএব চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন যদি সম্পূর্ণ করিতে হয়, তবে চিত্তকে ভগবানে বিন্যস্ত করিতে হইবে। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' লিখিয়াছেন,—

'ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্য-বিশিষ্ট। অনন্তের গুণ সান্ত বা পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। তিনি মহৎ, শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্বাঙ্গসম্পন্ন এবং নির্বিকার। এই সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল গুণের সমবায়ে যে সৌন্দর্য, তাহাও তাঁহাতে অনন্ত। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য অনুভূত করা যায়, তাহাদিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তাঁহাকে পাইব কি প্রকারে? তাঁহার সৌন্দর্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখনও তাঁহার প্রতি সম্যক্ প্রেম বা ভক্তি জন্মিবে না।'

কেবল চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি কেন? বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, প্রকৃত ধার্মিক হইতে হইলে, শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হইবে। কারণ, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম, ইহাই স্থায়ী সুখ, ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ 'ভক্তি প্রীতি শান্তি', ইহাই ধর্ম, ইহা ভিন্ন ধর্মান্তর নাই।

পুনশ্চ—'যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। * * ঈশ্বরকে সর্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। * * সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিবার যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কি হইতে পারে?

ধর্মতত্ত্বের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

'মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখিতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।'

ঈশ্বর যখন সচ্চিদানন্দ, তিনি যখন একাধারে প্রতাপঘন, প্রজ্ঞাঘন ও প্রেমঘন,—তখন তাঁহার সহিত মিলিত হইবার মার্গ শুধু কর্ম নয়—শুধু জ্ঞান নয়—শুধু ভক্তি নয়। কিন্তু কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তি-যোগের যে যুক্ত-ত্রিবেণী—উহাতে নিষ্ণাত হইলে তবেই জীব তাঁহার স্বারূপ্য লাভ করিতে পারে। 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ভগবদ্গীতা' অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিব। এখানে ইঙ্গিতমাত্র করিলাম।

আমরা দেখিলাম বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মসাধনে ভক্তিকে বিশিষ্ট স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে—এবং আমার 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' গ্রন্থে আমি এই তথ্য যথাসাধ্য প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কথায় আমার কিছু আপত্তি আছে। তিনি বলিয়াছেন 'প্রাচীন বৈদিক ধর্মে ভক্তি নাই'। এমন যে উপনিষদ্—যাহার সার্থক নাম বেদান্ত, যাহা বেদের চরম পরম ভাগ—বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ব্রহ্ম-নিরূপণ ও আত্মজ্ঞানই তাহার উদ্দিষ্ট। তিনি বলেন, 'শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্রেই আমরা প্রথম ভক্তির উল্লেখ পাই ; সে ভক্তি পরানুরক্তিঃ ঈশ্বরে—যদিও ছান্দোগ্য উপ-নিষদে ভক্তি শব্দ ব্যবহৃত না থাকিলেও একটী বচনে ভক্তিবাদের সার মর্ম আছে "এবং বিজানন্ আত্মরতিঃ আত্মক্রীড়ঃ আত্মমিথুনঃ আত্মানন্দঃ স স্বরাট্ ভবতি"। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐ শাণ্ডিল্যের নাম আছে এবং দেবকী-পুত্র কৃষ্ণেরও নাম আছে। অতএব কৃষ্ণ আগে কি শাণ্ডিল্য আগে তাহা আমি জানি না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কি শাণ্ডিল্য ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক তাহা আমি বলিতে পারি

না।' এ সম্পর্কে আমি আমার 'উপনিষদে ভক্তিবাদ' প্রবন্ধে যথোচিত আলোচনা করিয়াছি এবং প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, উপনিষদের ঋষিরা ব্রহ্মণ্যদেব যে 'রসো বৈ সঃ' তাহা জানিতেন এবং তাঁহাকে 'মধু ব্রহ্ম' বলিয়া অনুভব করিতেন। অধিকন্তু তাঁহাকে 'ভামনী বামনী (Lord of Love), দয়িত বনিত (Beloved)' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ' অর্থাৎ তিনি 'প্রিয়তম' এবং রসামৃতসিন্ধু রূপে অজস্র আনন্দের প্রস্রবণ। এমন কি পতিতে, জায়াতে, পুত্রে, বিত্তে আমরা যে আনন্দ অনুভব করি, সে আনন্দ সেই 'রসো বৈ সঃ'-এর, সেই রসামৃত-সিন্ধুর বিন্দু পান করিয়া— আনন্দ-কণিকার সংস্পর্শ লাভ করিয়া। ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ইত্যাদি। কারণ, এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রাম্ উপজীবন্তি (বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৩২); এষ এব আনন্দয়াতি * * রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি (তৈত্তিরীয়, ২।৭।১)।

বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্কাম ভক্তিকেই প্রেম বলিয়াছেন এবং ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদকে প্রেমের পরিণত মূর্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। 'নিষ্কাম প্রেমই যথার্থ ভক্তি এবং প্রহ্লাদই পরম ভক্ত।' প্রেম নিষ্কাম সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রেম যে ভক্তির প্রপূর্তি (apotheosis—বঙ্কিমচন্দ্র একথা কোথাও বলেন নাই। বস্তুতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যাহাকে প্রেমধর্ম বলেন, তাহার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আদৌ পক্ষপাত ছিল না। সেইজন্য দেখা যায় 'আনন্দমঠে' সন্তান সম্প্রদায়ের নায়ক সত্যানন্দের মুখ দিয়া তিনি চৈতন্যধর্মের প্রতি বেশ কটাক্ষ করিয়াছেন।

'চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন, তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব।'

ধর্মতত্ত্বের একবিংশ অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন :—

'ভগবদ্গীতা ছাড়া অন্যান্য হিন্দুগ্রন্থে যে সকল ভক্তির কথা আছে, তাহা গীতামূলক। কেবল চৈতন্যের ভক্তিবাদ ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু অনুশীলন ধর্মের সহিত সে ভক্তিবাদের সম্বন্ধ তাদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে—বরং একটুখানি বিরোধ আছে। অতএব আমি সে ভক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না।'

প্রেমধর্ম বর্ত্তমানে আমারও আলোচ্য নয়। প্রেমধর্ম সম্পর্কে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা আমার 'প্রেমধর্ম' গ্রন্থে সবিস্তারে বলিয়াছি।

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব

(৩)

আমরা দেখিয়াছি, 'ধর্মতত্ত্বে'র উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন— 'মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে তাহারা সকলেই ঈশ্বর-মুখী হয় (ঈশ্বরের বৈদান্তিক নাম 'ব্রহ্ম') ; ঈশ্বরমুখতাই বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।' প্রথমেই লক্ষ্য করা উচিত, বঙ্কিম-চন্দ্রের ব্যাখ্যাত ধর্মতত্ত্বের কেন্দ্রে ব্রহ্ম বা জগদীশ্বর। তিনি ধর্মতত্ত্বের সপ্তম অধ্যায়ে শিষ্যকে বলিতেছেন—

যদি বল, ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি,* কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি।†

* বঙ্কিমচন্দ্র নিজে পরকাল মনিতেন। তিনি ধর্মতত্ত্বের সপ্তম অধ্যায়ে শিষ্যকে বলিতেছেন—'তুমি পরকাল মান না মান, আমি মানি। * * ধর্ম নিত্য—ধর্ম ইহলোকেও সুখপ্রদ পরকালেও সুখপ্রদ। * * ইহলোককে আমি একটী পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে সৎবৃত্তিগুলি মার্জিত ও অনুশীলন করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি (পরকালে) অনন্ত সুখের কারণ হইবে, আর যে কেবল অসৎ বৃত্তিগুলি স্ফুরিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত দুঃখ।

† বঙ্কিমচন্দ্র এক সময়ে নাস্তিক ছিলেন। 'আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি অতি আশ্চর্য রকমের······।' (সাধনা—শ্রাবণ, ১৮৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্র ব্রহ্মতত্ত্ব কিরূপ বুঝিয়াছিলেন ?

ব্রহ্মতত্ত্ব অতিশয় দুরবগাহ—বুদ্ধদেবের ভাষায় 'সেয্যথাপি মহা-সমুদ্দো'—কারণ, অজর অমর অক্ষর ব্রহ্ম নামরূপের অতীত, দেশ-কাল-নিমিত্তের দ্বারা অপরিচ্ছন্ন…বাক্য মন তাঁহার লাগ না পাইয়া হটিয়া আসে—যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। তিনি বচনের মননের লক্ষণের বহির্ভূত। তাঁহার সম্বন্ধে শেষ কথা এই—'যস্যামতং তস্য মতং'—যে জানে সে জানে না, যে না জানে সেই জানে !

যিনি ঐরূপ, তাঁহার সম্পর্কে তর্কযুক্তির অবসর আছে কি ? নৈষা তর্কেণ মতি রাপনেয়া ; সেইজন্য তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ (ব্রহ্মসূত্র, ১।১)।

অতএব ব্রহ্মসম্বন্ধে চরম প্রমাণ—অপরোক্ষ অনুভূতি—পাশ্চাত্য মিষ্টিকেরা যাহাকে 'temperamental reaction to the *vision* of Reality' বলেন। এইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—Religion is realisation, অর্থাৎ ধর্ম hearsay-এর ব্যাপার নয়—'ইতি শুশ্রুম ধীরাণাম্' নয়—কিন্তু ধর্ম প্রত্যক্ষ, অপরোক্ষ অনুভূতি। যাঁহাদের ঐরূপ অপরোক্ষ অনুভূতি আছে, তাঁহাদের এ দেশীয় নাম ঋষি—ঋষি অর্থে দ্রষ্টা (Seer)। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উত্তর দিবার অধিকারী পুরোহিত নয়, পৈগম্বর—priest নয়, prophet—যিনি ঋষিদিগের সহিত (তা' সে ঋষি যে দেশের, যে কালের হউন না কেন) সুর মিলাইয়া বলিতে পারেন—

বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
জানিয়াছি আমি সেই পুরুষ মহান্।
তমসের পারে যিনি, চির জ্যোতিষ্মান্॥

লক্ষ্য করুন বঙ্কিমচন্দ্র যদিও শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোন দিন ঋষিত্বের অভিমান করেন নাই। তিনি বলিতেন—

"আমি সেই আর্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—'ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একত্বই মুক্তি। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হওয়াই মুক্তি। ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ। ঐ ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তি লাভ হয়।' বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু অন্যত্র লিখিয়াছেন—'ভক্তিবাদী বলেন জ্ঞানে ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কিন্তু জানিতে পারিলেই কি তাঁহাকে পাইলাম? অনেক জিনিষ আমরা জানিয়াছি বলিয়া কি তাহা পাইয়াছি? ব্রহ্ম অশরীরী—যিনি অশরীরী তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য। অতএব তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলে তবেই আমরা তাঁহাকে পাইব।'

এ ভক্তিমার্গীর কথা। জ্ঞানমার্গী বলিলেন, আমরা যে জানার কথা বলি, তাহা এরূপ জানা নহে, তাহা 'তত্ত্বতঃ' জানা। যিনি ব্রহ্মকে 'তত্ত্বতঃ' জানেন—অর্থাৎ realise করেন, যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান বুদ্ধিলব্ধ নয়—বোধিগ্রাহ্য অপরোক্ষ অনুভূতি—তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে তাঁহাকে পাইবেন বই কি! সেইজন্য গীতাকার ভগবানের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—ততো মাম্ তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্—১৮।৫৫।

সুখের বিষয় ঐরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা ব্রহ্মসম্পর্কে স্ব স্ব অনুভূতি অমর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাই সর্বজাতির বেদ এবং বেদের সার বেদান্ত বা উপনিষদ্। দেখা যায়, ব্রহ্মসম্পর্কে আচার্যদিগের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে। শঙ্কর বলেন—ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিরুপাধি,

নির্বিকল্প, নিরঞ্জন। রামানুজের মতে তিনি সমস্ত কল্যাণগুণের আশ্রয়—অধিকন্তু, নির্বিশেষে ব্রহ্মণি ন কিমপি প্রমাণং সমস্তি। উপনিষদের প্রতি দৃষ্টি করিলে কিন্তু দেখা যায় যে ঋষিদিগের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম একাধারে নির্বিশেষ-সবিশেষ, নিরুপাধি-সোপাধি, নির্বিকল্প-সবিকল্প, নিরঞ্জন-পুরঞ্জন। এই কথা আমি ৩৪ বৎসর পূর্বে আমার 'গীতায় ঈশ্বরবাদে' প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং দেখাইয়াছিলাম যে, ব্রহ্ম একাধারে বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ, উপাদান ও নিমিত্ত, চিৎ ও জড়, অণু ও মহান্, সগুণ ও নির্গুণ, সবিশেষ ও নির্বিশেষ, দূরে ও নিকটে, অন্তরে ও বাহিরে, Principle ও Person, তৎ ও সঃ—এক কথায় ব্রহ্ম "Supreme Unity of all contradictions"—তাঁহাতে সমস্ত বিরোধের চিরসমন্বয়, সমস্ত দ্বন্দ্বের চির-অবসান।

সেইজন্য তিনি 'সর্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং' অথচ 'সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিতং'। তিনি 'অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম্' অথচ 'সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদম্ অভ্যাত্তঃ।' তিনি 'অপাণিপাদো' অথচ 'জবনো গৃহীতা—পশত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ'—অচক্ষু দেখিতে পান, অপদ সর্বত্র যান, বিনা কর্ণে করেন শ্রবণ। সমুদ্রের যেমন নিষ্কম্প নিথর অবস্থা—আবার ফেনিল তরঙ্গিত অবস্থা, ব্রহ্মেরও সেইরূপ static ও kinetic অবস্থা। নিরুপাধি ব্রহ্ম static—নির্বিশেষ, নির্গুণ, কিন্তু মায়া-উপহিত ব্রহ্ম (মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর) kinetic—সবিশেষ, সগুণ। ঐ মায়াই ব্রহ্মের শক্তি—সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩০)। ঐ শক্তির potential অবস্থায় সৃষ্টি—ব্রহ্মের সবিশেষ সগুণ ভাব—এবং ঐ শক্তির static অবস্থায় প্রলয়—ব্রহ্মের নির্বিশেষ নির্গুণ ভাব। তিনি যখন অমায়ী—তখন তিনি static—নির্বিকল্প নিরুপাধি,

নির্বিশেষ, নির্গুণ। আর যখন তিনি মায়ী, তখন তিনি kinetic—সবিকল্প সোপাধি, সবিশেষ, সগুণ। অতএব সগুণ-নির্গুণ বিভিন্ন তত্ত্ব নয়—একমেবাদ্বিতীয়ম্ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই দ্বিবিধ বিভাব মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও ঠিক্ এ ভাবে কথাগুলি বলেন নাই —তবে 'ধর্মতত্ত্বে' মোটের উপর এ কথার অনুমোদন আছে।

"হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে অথবা ঈশ্বরকে দুই রকমে বুঝিয়া থাকে। ঈশ্বর নির্গুণ এবং ঈশ্বর সগুণ। তোমাদের ইংরেজীতে যাহাকে 'Absolute' বা 'Unconditioned' বলে, তাহাই নির্গুণ। যিনি নির্গুণ, তাঁহার কোন উপাসনা হইতে পারে না; যিনি নির্গুণ, তাঁহার কোন গুণানুবাদ করা যাইতে পারে না। যিনি নির্গুণ, যাঁহার কোন "Conditions of Existence" নাই বা বলা যাইতে পারে না, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব? কি বলিয়া তাঁহার চিন্তা করিব? অতএব কেবল সগুণ ঈশ্বরেরই উপাসনা হইতে পারে—নির্গুণবাদে উপাসনা নাই।"

কৃষ্ণ চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা সম্প্রসারিত করিয়াছেন :—

'আমি জানি যে, বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়াই মানেন। আমি পণ্ডিতও নহি, ভাবুকও নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পণ্ডিতগণও আমার মত, নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারেন না; কেননা মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দ্বারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নির্গুণ বুঝিতে পারি না, কেননা, আমাদের সে শক্তি নাই। মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নির্গুণ, এবং এই কথার উপর একটা দর্শনশাস্ত্র গড়িতে পারি, কিন্তু যাহা কথায় বলিতে পারি তাহা যে মনে বুঝি, ইহা অনিশ্চিত। "চতুষ্কোণ গোলক" বলিলে

আমাদের রসনা বিদীর্ণ হয় না বটে, কিন্তু 'চতুষ্কোণ গোলক' মানে ত' কিছুই বুঝিলাম না। তাই হার্বার্ট স্পেন্‌সর্‌ এতকাল পরে নির্গুণ ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া সগুণেরও অপেক্ষা যে সগুণ ঈশ্বর ("Something higher than Personality") তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছেন। অতএব আইস আমরাও নির্গুণ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিলে স্রষ্টা, বিধাতা, ধাতা, ত্রাণকর্তা কাহাকেও পাই না। এমন ঝক্‌মারিতে কাজ কি?'

এ কথায় আপত্তি করা চলে না—কেন না স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এ মতের পোষকতা করিয়াছেন।

> ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
> শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥
> যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
> সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্‌ ॥
> সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
> তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥
> ক্লেশোঽধিকতর স্তেষাম্‌ অব্যক্তাসক্ত-চেতসাম্‌।
> অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভি রবাপ্যতে ॥—গীতা ১২।২-৫

"যাহারা আমাতে মনোনিবেশ করিয়া পরমশ্রদ্ধা সহকারে নিত্য নিবিষ্টচিত্তে আমার উপাসনা করে, আমার মতে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী; আর যাহারা সর্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া সমস্ত ভূতের হিতে রত থাকিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারাও আমাকেই পায় বটে। তবে যাহারা ঐ অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করে, তাহাদিগকে অধিকতর ক্লেশ পাইতে হয়। কারণ, দেহধারী জীব অতি কষ্টে অব্যক্তা গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।"

এই সগুণ ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দ মঠে' সত্যানন্দের মুখে বলিয়াছেন :—

"যিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতির বিনাশহেতু, সর্বান্তর্যামী, সর্বজয়ী—যিনি সর্বশক্তিমান্ ও সর্বনিয়ন্তা, যিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন, তিনি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।"

অন্যত্র—"ঈশ্বর মহৎ, শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্বাঙ্গসম্পন্ন এবং নির্বিকার। এই সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য, তাহাও তাঁহার অপরিমেয়।"

এক কথায় ঈশ্বরের স্বরূপ বলিতে গেলে বলিতে হয়—তিনি সচ্চিদানন্দ—'সচ্চিদানন্দ-রূপায়'—তিনি একাধারে অস্তি-ভাতি-প্রিয়। জগতে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু 'সত্য' বলিয়া প্রতীত হইতেছে— সে সমুদয় সেই সৎ-এর উপর নির্ভর করিয়া—সেইজন্য তিনি 'সত্যস্য সত্যং'। বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা, বহুত্বের মধ্যে ঐক্য সিদ্ধ হয় কিরূপে? বিশ্বের পশ্চাতে যে এক অনন্ত অনির্বচনীয় শক্তি আছে (হার্বার্ট্ স্পেন্সর্ যাহাকে 'Inscrutable Power in Nature' বলিয়াছেন)—যাহা হইতে বিশ্ব জন্মিতেছে, যদ্দ্বারা চলিতেছে, যাহাতে অন্তিমে বিলীন হইতেছে—সেই চিৎ-এর উপর নির্ভর করিয়া। কিন্তু ঈশ্বর যেমন সৎস্বরূপ, যেমন চিৎস্বরূপ—তেমনি তিনি আনন্দস্বরূপ—তিনি বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম। সতে যে চিৎ-এর অবস্থান—তাহারই ফলে জাগতিক শৃঙ্খলা, তাহাতেই জীবনের উপযোগিতা;—চিতে যে আনন্দের যোগ তাহাতেই জীবের সুখ, উহাই নন্দন,—where pleasure is, there is God' (Browning). এই সচ্চিদানন্দকে জানিলে জগৎ অথবা জগৎকে 'তত্ত্বতঃ' জানিলে সচ্চিদানন্দকে জানিলাম।

ঈশ্বরের উপাসনা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' বেশ নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সগুণেরই উপাসনা—নির্গুণের উপাসনা নাই।

"ঈশ্বরই সর্বগুণের সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। সেইজন্য বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে ধর্ম সম্যক ধর্মত্ব প্রাপ্ত হয় না। * * যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল—কেন না, তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাঁহাকে 'Impersonal God' (?) বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল; যাঁহাকে 'Personal God' বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।"

উপাসনার বিবিধ প্রণালী ও পদ্ধতি আছে—অধিকারি-ভেদে প্রত্যেকেরই উপযোগিতা আছে। কিন্তু (বঙ্কিমচন্দ্র বলেন) মানুষের সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিবার যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা কি হইতে পারে? উপাসনার সার নির্যাস করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন:—

"ঈশ্বরের সর্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে, প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক—মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে।—তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতিঃ আমাদের চরিত্রে পড়িবে। তাঁহার নির্মলতার মত নির্মলতা, তাঁহার শক্তির অনুকারী সর্বত্র মঙ্গলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহার

সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্য ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন যে, তাহা হইলেই আমরা ক্রমে সারূপ্য সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব;—ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরে লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে।"

ঈশ্বর নিরাকার কি সাকার—বঙ্কিমচন্দ্র এই বিবাদারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। তবে তিনি গুরুর মুখে শিষ্যকে বলিয়াছেন—'আর যদি বল ঈশ্বর সাকার—তিনি শিল্পকারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে বিচার ফুরাইল।' প্রকৃত কথা এই—তিনি অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা—

অচক্ষুঃ দেখিতে পান, অপদ সর্বত্র যান, বিনা করে করেন গ্রহণ।

অর্থাৎ, তিনি 'সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং' যদি চ 'সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্'। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে সার কথা—অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্যকর্মণে!

কৌতূহলী পাঠক এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের গীতা-ভাষ্য ৮৭-৮ পৃষ্ঠা ও ১২৯১ পৌষের 'প্রচারে' প্রকাশিত 'গৌরদাস বাবাজিকে রামবল্লভ বাবুর ভিক্ষাদান' প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। সাকারবাদের সার্থকতা ঐ প্রবন্ধে চমৎকার ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঈশ্বর যদি নিরাকার হন, সাকার উপাসনা—বিশেষতঃ প্রতিমা-পূজা কেন? ঋষিরাই ত' বলিয়াছেন—ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ।

ধর্মতত্ত্বের বিংশতিতম অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন এবং ভাগবত হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকটী সাদরে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অর্চাদৌ অর্চয়েৎ তাবদ্ ঈশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ।
যাবৎ ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষবস্থিতম্॥—৩।২৯।২৫

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বকর্মে রত, সে যতদিন না আপনার হৃদয়ে সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদির পূজা করিবে। তবেই বিধিও রহিল, নিষেধও রহিল। নিম্নাধিকারীর পক্ষে বিহিত এবং উচ্চাধিকারী নিষিদ্ধ হইল। 'পূজা হোম যজ্ঞ নাম-সংকীর্তন সন্ধ্যাবন্দনাদি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের বিরোধী নহে। তবে উহাতে কোন প্রকার ঐহিক বা পারমার্থিক ফল নাই—ঐ সকল কেবল ভক্তির সাধন মাত্র।' এ সকল যে পরাভক্তির সাধন এবিষয়ে সন্দেহ নাই; ভক্ত্যা কীর্তনেন ভক্ত্যা দানেন পরাভক্তিং সাধয়েদিতি।—তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে বলিলেন উহাতে কোন প্রকার ঐহিক বা পারমার্থিক ফল নাই একথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর মুখে আরও বলিতেছেন—

"এ সকল নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন যাহা তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম সেই পূজাদি করিবে। তবে স্তুতি বন্দনা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বরচিন্তাই উহার উদ্দেশ্য, তখন উহা মুখ্য-ভক্তির লক্ষণ। যথা জীবন্মুক্ত প্রহ্লাদকৃত বিষ্ণুস্তুতি মুখ্য ভক্তি। আর 'আমার পাপ ক্ষালিত হউক, আমার সুখে দিন যাউক', ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যাবন্দনা, স্তুতি বা prayer—গৌণভক্তি মধ্যে গণ্য। আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যে, কৃষ্ণোক্তির অনুবর্তী হইয়া ঈশ্বরের কর্মতৎপর হও।"

গীতাভাষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এ-প্রসঙ্গ আবার উত্থাপিত করিয়াছেন। অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্—গীতার এই শ্লোকের ভাষ্য করিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"এই শ্লোকের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর নিরাকার, সাকার হইতে পারেন না। যাহা সাকার, তাহা সর্বব্যাপী হইতে পারে না

অতএব ঈশ্বর যদি সর্বব্যাপী হন, তবে তিনি সাকার নহেন। ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহাই গীতার মত। কেবল গীতার নহে, হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দুধর্মের ইহাই সাধারণ মত। উপনিষৎ ও দর্শনশাস্ত্রেরও এই মত। সে সকলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী চৈতন্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্য বটে, পুরাণেতিহাসে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সাকার চৈতন্য কল্পিত হইয়া অনেকস্থলে ঈশ্বরস্বরূপ উপাসিত হইয়াছেন। যে কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন বা উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধানের এস্থলে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য যে, পুরাণেতিহাসে শিবাদি সাকার বলিয়া কথিত হইলেও, পুরাণ ও ইতিহাসকারেরা ঈশ্বরের সাকারতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না, ঈশ্বর যে নিরাকার তাহা কখনই ভুলেন না। পুরাণেতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার।

* * তবে কি হিন্দুধর্মে সাকারের উপাসনা নাই? গ্রামে গ্রামে ত' প্রত্যহ প্রতিমা পূজা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রতিমার্চনায় পরিপূর্ণ। তবে হিন্দুধর্মে সাকারবাদ নাই কি করিয়া বলিব?

ইহার উত্তর এই যে, অন্যদেশে যাহা হউক, হিন্দুর প্রতিমার্চনা সাকারের উপাসনা নয়। এবং যে হিন্দু প্রতিমার্চনা করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত না হইলে মনে করে না যে, এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহা ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা। যে একখানা মাটির কালী গড়িয়া পূজা করে, সে যদি স্বকৃত উপাসনার কিছুমাত্র বুঝে, তবে সে জানে, এই চিত্রিত মৃৎপিণ্ড ঈশ্বর নহে বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে এবং সে জানে তাহা ঈশ্বরের প্রতিকৃতি হইতে পারে না।

তবে সে এ মাটির তালের পূজা করে কেন? সে যাঁহার পূজা করিবে, তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না। তিনি অদৃশ্য, অচিন্তনীয়, ধ্যানের

অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত। কাজেই সে তাঁহাকে ডাকিয়া বলে, "হে বিশ্বব্যাপিনি সর্বময়ি আদ্যাশক্তি! তুমি সর্বত্রই আছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখিতে পাই না; তুমি সর্বত্রই আবির্ভূত হইতে পার, অতএব আমি দেখিতে পাই এমন কিছুতে আবির্ভূত হও। আমি তোমায় যেরূপে কল্পনা করিয়া গড়িয়াছি, তাহাতে আবির্ভূত হও, আমি তোমার উপাসনা করি। নহিলে কোথায় পুষ্পচন্দন দিব, তদ্বিষয়ে মনঃস্থির করিতে পারি না।"

এই প্রতিমা পূজার উপরে আমাদের শিক্ষাগুরু ইংরেজদিগের বড় রাগ এবং তাহাদিগের শিষ্য নব্য ভারতবর্ষীয়েরও বড় রাগ। (ইঁহারা) অন্য মত বিবেচনা করা কুশিক্ষা, কুবুদ্ধি এবং নীচাশয়তার কারণ মনে করেন।

আমরা এরূপ উক্তির অনুমোদন করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, —সকলের অন্তর্যামী। সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের উপাসনা গ্রহণ করিতে পারেন। কি নিরাকারের উপাসক, কি সাকারোপাসক—কেহই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত করিতে পারেন না। তিনি অচিন্তনীয় অতএব তাঁহার চক্ষে সাকার উপাসকের উপাসনা ও নিরাকার উপাসকের উপাসনা তুল্য; কেহই তাঁহাকে জানে না। যদি ইহা সত্য হয়, যদি ভক্তিই উপাসনার সার হয়, এবং ভক্তিশূন্য উপাসনা যদি তাঁহার অগ্রাহ্যই হয়, তবে ভক্তিযুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট গ্রাহ্য; ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকটে পৌঁছিবে না। অতএব আমাদের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষীয়ের যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে সাকার-উপাসনার ভাবে আচ্ছন্ন হইলেও কেহ উৎসন্ন যাইবে না; আর ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসনায়ও উৎসন্ন হইবে, তদ্বিষয়ে

কোন সংশয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই নিষ্ফল নহে; এবং এতদুভয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ নাই। সুতরাং উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার নিষ্প্রয়োজন।”

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, ধর্মের উচ্চচূড়ায় আরোহণ করিতে হইলে কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়।

‘ধর্মের প্রথম সোপান বহু দেবের উপাসনা,—দ্বিতীয় সোপান সকাম ঈশ্বরোপাসনা—তৃতীয় সোপান নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনা (বা বৈষ্ণবধর্ম) অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। ধর্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা।’

—কৃষ্ণচরিত্র

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত বুঝিতে হইলে ঐ দেবোপাসনা বুঝিতে হয়। অতএব আগামী অধ্যায়ে আমরা তাঁহার কথিত দেবতত্ত্বের আলোচনা করিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব

(৪)

গত অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ধর্মের উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিতে হইলে কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়।

'ধর্মের প্রথম সোপান বহুদেবের উপাসনা,—দ্বিতীয় সোপান সকাম ঈশ্বরোপাসনা—তৃতীয় সোপান নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনা (বা বৈষ্ণবধর্ম) অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। ধর্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা।'—কৃষ্ণচরিত্র

দেবোপাসনারও সোপান-পরম্পরা আছে। ঐ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র এইরূপ বলিয়াছেন—

"ধর্মের প্রথম সোপান, "শরীর হইতে চৈতন্য একটা পৃথক্ সামগ্রী" এই বোধ। "জড়ে চৈতন্য-আরোপ" ধর্মের দ্বিতীয় সোপান। এই সকল মহাশক্তিযুক্ত মঙ্গলামঙ্গল-সম্পাদক পদার্থ যদি চৈতন্য-বিশিষ্ট হয়, তবে তাহারাও সেই নিয়মের বশীভূত, ইহা আদিম মানুষ মনে করে। মনে করে, তাহাদের তুষ্ট রাখিতে পারিলে সর্বত্র মঙ্গল, তাহারা রুষ্ট হইলে সর্বনাশ হইবে। ইহাতে উপাসনার উৎপত্তি। ইহাই ধর্মের তৃতীয় সোপান।"

বঙ্কিমচন্দ্র বহু দেবের উপাসনাকে ধর্মের প্রথম সোপান বলিলেন। একথা ঠিক্—কিন্তু দেবতা কি? দেবতত্ত্ব লইয়া প্রচুর মতভেদ আছে।

দেবদেবীর কি মানুষের মত স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব আছে অথবা তাঁহারা ভগবানের গুণ বা বিভূতির সাকার প্রতীক মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচারে' দেবতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সে আলোচনা সম্পূর্ণ হইতে পায় নাই।

সম্প্রতি সুসাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম' ইতি শীর্ষক যে অভিভাষণ শ্রীরামপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উৎসবে পাঠ করেন, তাহাতে তিনি 'হিন্দুধর্ম ও দেবতত্ত্ব' নামক বঙ্কিমচন্দ্রের এক অসম্পূর্ণ অপ্রকাশিত গ্রন্থের সন্ধান দিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই। সজনী বাবুর অভিভাষণে প্রকাশ ঐ গ্রন্থ মোট ১৭ অধ্যায়ে বিভক্ত।

বিভাগগুলি এইরূপ :—১। হিন্দুধর্ম, ২ ও ৩। বেদ, ৪। বেদের দেবতা, ৫। ইন্দ্র, ৬। কোন পথে যাইতেছি, ৭। বরুণাদি, ৮। সবিতা ও গায়ত্রী, ৯। বৈদিক দেবতা, ১০। দেবতত্ত্ব, ১১। দ্যাবা-পৃথিবী, ১২। চৈতন্যবাদ, ১৩। উপাসনা, ১৪। হিন্দু কি জড়োপাসক ? ১৫। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা, ১৬। বেদের ঈশ্বরবাদ, ১৭। হিন্দুধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই।

সজনী বাবুর পরিচয়ে জানা যায় বঙ্কিমচন্দ্র ঐ অপ্রকাশিত গ্রন্থে অগ্নি প্রভৃতি বেদোক্ত তেত্রিশ জন দেবতা লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন এবং তেত্রিশ কিরূপে তেত্রিশ কোটি হইল, তাহার বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, হিন্দুর বৈদিকতত্ত্ব ত্রিবিধ (১) দেবতা-তত্ত্ব, (২) ঈশ্বরতত্ত্ব, ও (৩) আত্মতত্ত্ব। দেবতাতত্ত্ব প্রধানতঃ সংহিতায়; আত্মতত্ত্ব উপনিষদে; ঈশ্বরতত্ত্ব উভয়ে।

ঐ অপ্রকাশিত গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"বৈদিক ধর্মের তিন অবস্থা—(১) প্রথম, দেবোপাসনা অর্থাৎ

জড়ে চৈতন্য-আরোপ এবং তাহার উপাসনা (২) ঈশ্বরোপাসনা, এবং তৎসঙ্গে দেবোপাসনা (৩) ঈশ্বরোপাসনা এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয়।

বৈদিক ধর্মের চরমাবস্থা উপনিষদে। সেখানে দেবগণ একেবারে দূরীকৃত বলিলেই হয়। কেবল আনন্দময় ব্রহ্মই উপাস্যস্বরূপে বিরাজমান। এই ধর্ম অতি বিশুদ্ধ কিন্তু অসম্পূর্ণ। ইহাই চতুর্থাবস্থা।

শেষে গীতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আবির্ভাবে এই সচ্চিদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি মিলিতা হইল। তখন হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ধর্ম এবং ধর্মের মধ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনা—ইহাই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম। ইহাই সকল মনুষ্যের অবলম্বনীয়।"

ধর্মতত্ত্বে ও কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এ সকল কথার সম্প্রসারণ করিয়াছেন এবং দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহারও বিবৃতি দিয়াছেন।

দেবতত্ত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত বুঝিতে হইলে তাঁহার পূর্ববর্তীগণের মতামত জানা আবশ্যক। রাজা রামমোহন রায়ের মতে, দেবতারা 'are allegorical representations of the attributes of the Supreme Being', অর্থাৎ ঈশ্বরের গুণাবলীর রূপকনেপথ্য*। স্বামী দয়ানন্দ বলিতেন, ইন্দ্র অগ্নি বরুণ সোম প্রভৃতি

* The Veda having, in the first instance, personified all the powers and attributes of the Deity and also the celestial bodies and natural elements, does, in conformity with this idea of personification, treat of them in the subsequent passages, as if they were real beings, ascribing to them birth, animation, senses and accidents as well as liability to annihilation.

বৈদিক দেবতারা একেশ্বর পরমেশ্বরেরই নামান্তর মাত্র—'So many forms of speech to indicate the One Reality—these names denote Iswara in His various aspects'। অধ্যাপক মোক্ষমুলারের মতে দেবতারা প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের কল্পিত ব্যক্তিত্বারোপ মাত্র—

Personifications of the powers of Nature, manifesting in physical and atmospheric phenomena. †

বঙ্কিমযুগে এই মতই শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত ছিল এবং দেখা যায় মোটের উপর বঙ্কিমচন্দ্র এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।

সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অভিন্নশরীর গৌরদাস বাবাজির প্রমুখাৎ আমরা শুনিতে পাই—

"ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা নাই। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই যেমন পালন করেন ও ধ্বংস করেন, তিনিই আবার বৃষ্টি করেন, তিনিই দাহ করেন, তিনিই ঝড়-বাতাস করেন, তিনিই আলো করেন, তিনিই অন্ধকার করেন। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি, তিনিই সর্ব দেবতা। তবে যেমন আমাদের বুঝিবার সৌকর্য্যার্থ, এক জলকে কোথাও নদী বলি, কোথাও সমুদ্র বলি, কোথাও বলি বিল, কোথাও

† 'He (the Vedic Aryan) gives names to all the powers of Nature, and after he has called the fire—Agni, the sun-light—Indra, the storms—Maruts, the dawn—Ushas, they all seemed to grow naturally into beings like himself. He invokes them, he praises them, he worships them.

পুকুর বলি, কোথাও ডোবা বলি, কোথাও গোষ্পদ বলি,—তেমনি উপাসনার জন্য কখন ইন্দ্র, কখন অগ্নি, কখন ব্রহ্মা, কখন তাঁহাকে বিষ্ণু ইত্যাদি নানা নাম দিই।”

বাবাজি আরও বলিতেছেন :—

“যাঁহাদের আমরা দেবতা বলি, তাঁহারা আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ নির্বাহ করেন। সেই ক্ষমতার নাম শক্তি। অগ্নির দাহ করিবার ক্ষমতাই তাঁর শক্তি, তাহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র বৃষ্টি করেন; বৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ু-দেবতা, পবন-শক্তির নাম পবনানী। রুদ্র সংহারকারী দেবতা, তাঁহার সংহারশক্তির নাম রুদ্রাণী।”

দেবতা কি শরীরী না অশরীরী? বঙ্কিমচন্দ্র বলেন অশরীরী। প্রশ্ন উঠিবে—যদি অশরীরী—তবে মূর্তি গড়িয়া তাঁহার উপাসনা কেন? উত্তরে বাবাজি ওরফে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

“উপাসনার জন্য উপাস্যের স্বরূপ চিন্তা চাই, নহিলে মনোনিবেশ হয় না। ধর রুদ্রদেবতা—নিরাকার বিশ্বব্যাপী রুদ্রের স্বরূপ চিন্তা করিবে কিরূপে? যে জ্ঞানী ধ্যানী সে হয়ত পারে। কিন্তু যাহার জ্ঞান নাই—সে কি উপাসনা হইতে বিরত থাকিবে? তাহা উচিত নয়। যাহার জ্ঞান নাই, সে যেরূপে রুদ্রকে চিন্তা করিতে পারে সেরূপ করিয়া উপাসনা করিবে। এ সব স্থলে রূপ কল্পনা করিয়া চিন্তা করা সহজ। * * নচেৎ রুদ্রের কোন রূপ নাই।”

যদি প্রশ্ন কর—রুদ্রের শক্তি ত’ রুদ্রেই আছে, তবে শিব দুর্গা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া গড়িয়া পূজা করি কেন? বাবাজি উত্তরে বলেন—

‘তোমাকে ভাবিলেই তোমার শক্তি জানিলাম না। অগ্নিতে যে কখন হাত দেয় নাই, সে অগ্নি দেখিলেই বুঝিতে পারে না যে,

অগ্নিতে হাত পুড়িয়া যাইবে। গাঁজা পুড়িতেছে দেখিয়া যে আর কখন অগ্নি দেখে নাই, সে বুঝিতে পারে না যে আগুণের আলো করিবার শক্তি আছে। অতএব শক্তি এবং শক্তির আলোচনা পৃথক্ করিয়া না করিলে শক্তিকে বুঝিতে পারিবে না। রুদ্রও নিরাকার, রুদ্রের শক্তিও নিরাকার। যে অজ্ঞান এবং নিরাকারের স্বরূপ চিন্তায় অক্ষম, তাহাকে উপাসনার্থ উভয়েরই রূপ কল্পনা করিতে হয়।'

'কৃষ্ণচরিত্রে' কৃষ্ণ কর্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞ নিষেধ ও গিরিযজ্ঞ প্রচার-প্রসঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাই বলিয়াছেন ঃ—

"এই জগতের একই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়া কোন দেবতা নাই। ইন্দ্‌ ধাতু বর্ষণে, তাহার পর রক্ প্রত্যয় করিলে ইন্দ্রশব্দ পাওয়া যায়। অর্থ হইল যিনি বর্ষণ করেন। বর্ষণ করেন কে? যিনি সর্বকর্তা, সর্বত্র বিধাতা, তিনিই বৃষ্টি করেন,—বৃষ্টির জন্য একজন পৃথক্ বিধাতা কল্পনা করা বা বিশ্বাস করা যায় না। তবে ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ বা সাধারণ যজ্ঞে ইন্দ্রের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরূপ ইন্দ্রপূজার একটা অর্থও আছে। ঈশ্বর অনন্ত-প্রকৃতি, তাঁহার গুণসকল অনন্ত, কার্য অনন্ত, শক্তিসকলও সংখ্যায় অনন্ত। এরূপ অনন্তের উপাসনা কি প্রকারে করিব? অনন্তের ধ্যান হয় কি? যাহাদের হয় না, তাহারা তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করে। এরূপ শক্তিসকলের বিকাশস্থল জড়জগতে বড় জাজ্জ্বল্যমান। সকল জড়পদার্থে তাঁহার শক্তির পরিচয় পাই। তৎসাহায্যে অনন্তের ধ্যান সুসাধ্য হয়। এইজন্য প্রাচীন আর্যগণ তাঁহার জগৎ-প্রসবিতৃত্ব স্মরণ করিয়া সূর্যে, সর্বাবরকতা স্মরণ করিয়া বরুণে, তাঁহার সর্বতেজের আধারভুতি স্মরণ করিয়া অগ্নিতে, তাঁহাকে জগৎপ্রাণ স্মরণ করিয়া বায়ুতে, এবং তদ্রূপে অন্যান্য জড়পদার্থে

তাঁহার আরাধনা করিতেন। ইন্দ্রে এইরূপ তাঁহার বর্ষণকারিণী শক্তির উপাসনা করিতেন।"

ঈশ্বর এক— একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি—এক এব মহেশ্বরঃ। তিনি শুধু এক নন—তিনি অ-দ্বিতীয়, কেবল Unit নন, Unique—একমেবাদ্বিতীয়ং। কিন্তু মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে যে বিরাট্ ব্যবধান, সেই অন্তরাল যে জনশূন্য (untenanted, empty of living beings) —এরূপ মনে করিবার কি সঙ্গত যুক্তি আছে।* বরং অধ্যাপক হাক্স্লির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলা উচিত—'Without stepping beyond the analogy of that which is known, it is easy to people the cosmos with entities in ascending scale, until we reach something practically indistinguishable from omnipotence, omnipresence and omniscience.—Essays upon Some Controverted Questions, page 36. এই সকল 'Entities in ascending scales'-ই আমাদের পরিচিত দেব-দেবী, খৃষ্টানের Angels, Archangles, পারসিকের ফেরেস্তা ইত্যাদি।

---

* এ প্রসঙ্গে Bulwer Lytton-এর একটি উক্তি আমাদের প্রণিধানযোগ্য :—Reasoning then by evident analogy,—if not a leaf, if not a drop of water, but is, no less than yonder star, a habitable and breathing world * * common sense would suffice to teach that the circumfluent infinite which you call space—the boundless impalpable which divides earth from the moon and stars—is filled also with its correspondent and appropriate life. Is it not a visible absurdity to suppose that being is crowded upon every leaf and yet absent from the immensities of space? * * The microscope shews you the creatures on the leaf; no mechanical tube is yet invented to discover the nobler and more gifted things that hover in the illimitable air.—Zanoni, Book IV. Chap IV

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। একথা খুব ঠিক। জগৎতত্ত্ব বুঝিতে হইলে বিশ্বের পশ্চাতে একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণের অনুসন্ধান করিতে হয়। ঐ কারণই বেদান্তের ব্রহ্ম, আস্তিকের ঈশ্বর, হার্বার্ট স্পেন্সরের "Inscrutable Power in Nature"। কিন্তু দেবদেবীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে বিশ্বের অনেক সমস্যার সমাধান করিতে পারা যায় না। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত আমার 'Philosophy of the Gods—Deva-tattwa' নামক ইংরাজি গ্রন্থে আমি এ বিষয়ের যথোচিত আলোচনা করিয়াছি —এস্থলে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

এ প্রসঙ্গে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেবদেবী থাকিলেও তাঁহারা আমাদের উপাস্য হওয়া উচিত নয়—কারণ, গীতার কথায় বলি

দেবান্ দেবব্রতা যান্তি মদ্‌ভক্তা যান্তি মামপি—৭।২৩

এ সম্পর্কে আমার ঐ 'দেবতত্ত্ব' গ্রন্থে আমি এইরূপ লিখিয়াছি :—

Are we then to worship the Devas? By no means. Iswara, the Supreme Being, is the only true object of worship and if ignoring or losing sight of Him, our worship should be confined to the Devas, we shall miss attaining the highest good. Of course, we may use the Devas as stepping stones in the path of spiritual progress and if unable, with our finite minds, to conceive or worship the Supreme God, we may step by step rise up to His height by the stair-way of these subordinate gods.

উপাসনা ও উপাস্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত পূর্বেই উদ্ধৃত

হইয়াছে। পাঠক তাহা হইতে নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বরই মূল ও মুখ্যতত্ত্ব। " 'গড' বলি, 'আল্লা' বলি, 'ব্রহ্ম' বলি—সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ, জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী—সেই বৈষ্ণব।" সেই জন্য 'বৈষ্ণব' গৌরদাস বাবাজি বলিতেছেন :—

"ভগবান্‌কে দুইভাবে চিন্তা করা যায়। যখন তাঁহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নির্গুণ এবং সর্বজগতের আধার বলিয়া চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা। আর যখন তাঁহাকে ব্যক্ত, উপাস্য, সেইজন্য চিন্তনীয়, সগুণ এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা-স্বরূপ চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম সাধারণ কথায় ঈশ্বর, বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষ্ণু বা শিব। আর যখন এককালীন তাঁহার উভয়বিধ লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি, অর্থাৎ যখন তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদিত হন, তখন তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ।"

এ জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের সোপান নির্দেশ করিতে বলিলেন—'ধর্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা'।

ধর্মতত্ত্বের বাকি কথা আগামী অধ্যায়ে বলিব।

সপ্তম অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব

(৫)

বিগত কয়েক অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অবদান ধর্মতত্ত্বের আমরা যে আলোচনা করিলাম তাহা হইতে পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ধর্মের সারাৎসার অনুশীলন—অর্থাৎ, অধ্যাপক সীলির ভাষায়, the Substance of Religion is Culture।* উহাতে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র বিলাতি অনুশীলন-তত্ত্বের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর মুখ দিয়া এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন :—

শিষ্য। এ যে বিলাতি Doctrine of Culture.

গুরু। Culture বিলাতি জিনিষ নহে—উহা হিন্দু ধর্মের সারাংশ।

শিষ্য। সে কি কথা ? Culture শব্দের একটা প্রতিশব্দ আমাদের দেশীয় কোন ভাষায় নাই।

গুরু। আমরা কথা খুঁজিয়া মরি, আসল জিনিষটা খুঁজি না, তাই আমাদের এমন দশা। দ্বিজাতির চতুরাশ্রম কি মনে কর ?

শিষ্য। System of Culture ?

গুরু। এমন, যে তোমার Matthew Arnold-প্রভৃতি বিলাতি অনুশীলনবাদীদিগের বুঝিবার সাধ্য আছে কিনা সন্দেহ। সধবার

* ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলন, প্রথম অধ্যায়।

পতিদেবতার উপাসনায়, বিধবার ব্রহ্মচর্যে, সমস্ত ব্রত নিয়মে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, যোগে, এই অনুশীলনতত্ত্ব অন্তর্নিহিত। যদি এই তত্ত্ব কখন তোমায় বুঝাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে যে, শ্রীমদ্ভগবগীতায় যে পরম পবিত্র অমৃতময় ধর্ম কথিত হইয়াছে, তাহা ঐ অনুশীলনতত্ত্বের উপর গঠিত।

'ধর্মতত্ত্বে'র অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, মনুষ্যত্ব ও অনুশীলনধর্ম যাহা তিনি ঐ গ্রন্থে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, তাহা ঐ গীতোক্ত ধর্মেরই নূতন ব্যাখ্যা মাত্র।

এ কথা অস্বীকার করি না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্বে'র স্থানে স্থানে বিলাতি অনুশীলন-তত্ত্বের প্রতিধ্বনি আছে; কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে, দুইটি মর্মান্তিক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারিত ধর্মতত্ত্ব বিলাতি অনুশীলনতত্ত্ব হইতে বিভিন্ন। 'ধর্মতত্ত্বে'র প্রথম অধ্যায়ে দেখি গুরুকে শিষ্য বলিতেছেন—'আমি যতদূর বুঝি, পাশ্চাত্য অনুশীলনতত্ত্ব নাস্তিকের মত। এমন কি, নিরীশ্বর কোমৎ-ধর্ম অনুশীলনের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়।' উত্তরে গুরু বলিতেছেন :—

'একথা অতি যথার্থ। বিলাতি অনুশীলনতত্ত্ব নিরীশ্বর—এই জন্য উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত অথবা উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিমিত বলিয়াই নিরীশ্বর,—ঠিক সেটা বুঝি না। কিন্তু হিন্দুরা পরম ভক্ত, তাঁহাদিগের অনুশীলনতত্ত্ব জগদীশ্বর-পাদপদ্মেই সমর্পিত'।

অধিকন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, বিলাতি অনুশীলন-তত্ত্বের উদ্দেশ্য সুখ মাত্র—ভারতীয় অনুশীলন তত্ত্বের উদ্দেশ্য মুক্তি—যাহাতে সুখের পরাকাষ্ঠা, 'অতিন্নীম্ আনন্দস্য'। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন —'অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ'। মোক্ষ কি ? 'মোক্ষ আর কিছুই নয়,

ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত স্বভাব-প্রাপ্তি'—গীতায় ভগবান্ যাহাকে 'মম সাধর্ম্যম্ আগত' (similitude of God) বলিয়াছেন—খৃষ্টানেরা যাহাকে 'Deification'—'Be ye perfect as your Father-in-Heaven is perfect'—বলেন।* বিলাতি অনুশীলনতত্ত্বে এ কথার বিন্দুবিসর্গ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলিয়াছেন, মুক্তি পূর্ণ মনুষ্যত্ব। অন্যত্র তাঁহার নিজের উক্তি এই—'ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই ভক্তি।' অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বর ভিন্ন ধর্ম নাই ও অনুশীলন নাই।

ধর্মের পূর্ণ প্রকৃতি জ্ঞানে পাওয়া বড় দুষ্কর। বোধি-বর্জ্জিত বুদ্ধিমাত্র-সার পাশ্চাত্য অনুশীলনবাদী সে প্রকৃতি জানিবে কিরূপে? এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ লিখিয়াছেন—

'যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দূরে যাক্, শাক্যসিংহ, যিশুখৃষ্ট, কি চৈতন্য, তাঁহারাও ধর্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমন স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশী দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার।'

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'ধর্মের সার Culture—কর্ষণ—মানববৃত্তির উৎকর্ষণই ধর্ম'। অঙ্কুরের দৃষ্টান্ত দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয় বুঝাইয়াছেন—

* এই মহোচ্চ অবস্থা (exalted condition) কিরূপ—পরবর্তী 'বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার ধর্ম' প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

"অঙ্কুরের পরিণাম মহামহীরুহ। মাটি খোঁজ, হয়ত একটি অতি ক্ষুদ্র, প্রায় অদৃশ্য অঙ্কুর দেখিতে পাইবে। পরিণামে সেই অঙ্কুর এই প্রকাণ্ড বৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ—কৃষকেরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই। সরস মাটি চাই—জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই—আওতায় থাকিলে হইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষ-শরীরের পোষণ জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃত্তিকায় থাকা চাই—বৃক্ষের জাতি-বিশেষে মাটিতে সার দেওয়া চাই, ঘেরা চাই। ইত্যাদি। তাহা হইলে অঙ্কুর সুবৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যেরও এইরূপ। যে শিশুর কথা বলিলে, ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর। বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্বগুণযুক্ত, সর্বসুখসম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি।

অবশ্য, এক জন্মের কর্ষণে অনুশীলন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তবে আমাদের ভরসা এই যে কর্ষণের ফল একেবারে বিলুপ্ত হয় না। কারণ, এ জন্মের অনুশীলনের যে শুভ ফল, তাহা অনুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং একথা অর্জুনকে বলিয়াছেন।

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্" ইত্যাদি—গীতা, ৬।৪৩"

আমার 'কর্মবাদ ও জন্মান্তর' গ্রন্থে প্রাচ্যমতে জীবের ক্রমবিকাশ (evolution) বুঝাইতে, আমি এ কথা আর একটু বিশদ করিয়াছি।

"জীব প্রথমে স্থাবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমবিকাশের ফলে স্থাবর রাজ্য অতিক্রম করিয়া জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হয়। জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হইয়া পাদপ রাজ্য (Vegetable Kingdom) অতিক্রম করতঃ প্রথমে সে সরীসৃপের দেহ ধারণ করে। ক্রমশঃ বিবর্তনের

ফলে সে সরীসৃপ হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশু দেহে প্রবেশ করে। পশু রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বহুজন্ম অতিবাহিত করিয়া অবশেষে জীব মনুষ্যদেহ ধারণের উপযোগী হয়। মানবের মধ্যেও প্রথম অসভ্য, তাহার পর সভ্য, চরমে সুসভ্য মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সেখানেও তাহার ক্রমবিকাশ শেষ হয় না। মানুষ ক্রমে অতি-মানুষ হয়। মানবতার সীমা অতিক্রম করিয়া জীব অবশেষে জীবন্মুক্ত হয়। ইহাই ক্রমবিকাশের শেষ সোপান।

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাচ্য বিবর্তনবাদের সহিত জন্মান্তর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। জীব বহু বহু বার জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া ক্রমবিকাশের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। প্রত্যেক জন্মে সে উন্নতি করিবার যে সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা প্রায়ই সে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া থাকে, কখনও বা দু'এক পদ পিছাইয়াও আইসে। প্রত্যেক জন্মের সংস্কার জীবের মধ্যে সুরক্ষিত হয় এবং পরজন্মে সে সেই সংস্কারের সুবিধা ভোগ করে।"

অর্থাৎ, "জীব এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং প্রত্যেক জন্মে সে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তাহা প্রজ্ঞা ও সামর্থ্যে রূপান্তরিত হয়। অতএব প্রত্যেক জন্মই তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের এক একটি সোপান-স্থানীয়। সে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া চরমে নিজের গম্যস্থানে উপনীত হয়। এই গম্যস্থান পূর্ণতাসিদ্ধি।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন—ধর্মের সার কর্ষণ। কিসের কর্ষণ? 'প্রকৃতির ক্ষেত্রে উপ্ত বীজের কর্ষণ।'

মম যোনির্মহদ্-ব্রহ্ম তস্মিন্ বীজং দধাম্যহম্---গীতা, ১৪।৩

(মহদ্-ব্রহ্ম = প্রকৃতি)

প্রকৃতি-ক্ষেত্রে যে বীজ উপ্ত হয়, বিবর্তনের ফলে তাহা অঙ্কুরিত,

পল্লবিত, বিটপিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া চরমে মহা-মহীরুহ-রূপে আত্মপ্রকাশ করে*—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠতি একঃ—উপনিষৎ

এই যে প্রকৃতি-ক্ষেত্রে উপ্ত বীজ, যাহা কর্ষণের চরম ফলে একদিন মহামহীরুহে বিকশিত হইবে—ঐ বীজ ব্রহ্ম-মোক্ষিত বীজ। সেইজন্য উহাকে ব্রহ্ম-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ, (যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি সহস্রশঃ), ব্রহ্মসিন্ধুর বিন্দু—এক কথায় ব্রহ্ম-খণ্ড (Divine fragment) বলা হয়—অংশো নানাব্যপদেশাৎ (ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪৩)

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা, ১৫।৭

আমরা দেখিয়াছি, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—তিনি একাধারে প্রতাপঘন, প্রজ্ঞাঘন ও প্রেমঘন—'the glorious Trinity of Power, Wisdom and Love'—সন্ধিনী, সংবিৎ, ও হ্লাদিনী শক্তির (খৃষ্টানী ভাষায় Life, Light and Love-এর) বিস্ফূর্জিত মূর্তি। জীব যখন ব্রহ্মের প্রতিচ্ছবি ('God made Man in His Own image'—Bible), তখন জীবের অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই ঐ সচ্চিদানন্দ ভাব, ঐ প্রতাপ-প্রজ্ঞা-প্রেম বিস্ফূর্ত না হইলেও অব্যক্তভাবে বিদ্যমান আছে—

সত্যম্ অজ্ঞানম্ অনন্তংচেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী, ৩।২৮

---

* The individual is born many many times on earth, gradually transmuting the experiences gained in each life into wisdom and faculty, so that each incarnation represents for him a growth in mental and moral capacity, and takes him one step near his goal—the perfecting of his being.—Stevenson Howell in Theosophic Review for January 1925 P. 32.

জীবে ও ব্রহ্মে এই ভেদ যে, ব্রহ্মে যাহা পূর্ণ-বিকশিত, জীবে তাহা বীজাবস্থ। সেইজন্য ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক—

অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২২

জন্মজন্মান্তর-কৃত কর্ষণ দ্বারা জীবের ঐ অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ ভাব ব্যক্ত হইতে ব্যক্ততর হয়, ঐ প্রচ্ছন্ন সন্ধিনী সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির প্রস্ফুরণ হয়, ঐ অস্পষ্ট প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম বিস্ফূর্জিত হয়। ইহারই নাম ক্রমবিকাশ* (Evolution—E=out and volve=to roll—প্রচ্ছন্নের বহিঃ-প্রকাশ, অব্যক্তের বক্তীভবন)। যে জীবে ঐ প্রতাপ প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত, ঐ সচ্চিদানন্দ ভাব মহোজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্মের সারূপ্যসিদ্ধ, তিনিই মুক্ত। এই তত্ত্বের উপদেশ করিয়া বাইবেল্ বলিয়াছেন—He is sown in weakness so that he may be raised in power.† মাতার কুক্ষিতে যেমন কলল বা সন্তানবীজ ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়, প্রকৃতির ক্ষেত্রে উপ্ত ঐ জীব-বীজও 'sown in weakness' হইয়া চরমে 'raised in power' হয়। সেইজন্য জীবকে বলা হয়—'Logos in gestation', 'God in the making'; যে জীব 'raised in power,' যিনি সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়াছেন, এক কথায় যিনি জীবন্মুক্ত—তিনিই 'Made God', তিনিই ব্রহ্মসারূপ্য-সিদ্ধ। তিনিই বেদান্তের মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া

---

* 'Evolution is a growth from within—an unfolding of potentialities which are unexhaustible'. So it is said—All powers and capacities lie latent within, pre-existent—awaiting the right conditions for their manifestation.

† The evolution of man as man consists in the gradual manifestation of those three aspects (সৎ, চিৎ ও আনন্দ), their development from latency into activity.—Dr Annie Besant.

বলিতে পারেন—সোঽহং, অহং ব্রহ্মাস্মি—ক্রাইষ্টের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন, 'I and my Father are One'। সেইজন্য বলা হইয়াছে, অজর অমর অক্ষর জীবের যে ভবিষ্যৎ নিয়তি, তাঁহার যে ভাবী মহিমা-গরিমা—তাহা ইয়ত্তার অতীত। 'The Soul of Man is eternal and its future is the future of a thing whose splendour has no limit,'. (The Idyll of the White Lotus)। ইহাই 'ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলনে'র সার কথা।

আমরা দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তিগুলির (অনুশীলন দ্বারা) সম্যক্ স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই ধর্মের লক্ষ্য—তাঁহার মতে তিনিই আদর্শ মনুষ্য যাঁহার সকল বৃত্তি সম্যক্ স্ফূর্ত, পরিণত ও পরস্পর সমঞ্জস। এই অবস্থাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব—ইহাই মোক্ষ।

এই মতের প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া অধুনা স্বর্গগত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় তাঁহার ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছিলেন :—

'বঙ্কিম বাবুর মতে বৃত্তি সকলের পূর্ণ স্ফূর্তি ও পরিণতিতে আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। * * এ সিদ্ধান্ত সর্বথা সঙ্গত নহে। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষেত্রের দিক্ হইতেই জীবকে দেখিয়াছেন—ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার দিক্ হইতে তাহাকে দেখিতে চেষ্টা করেন নাই। * * আত্মার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ-লাভ দ্বারা জীবের অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ বা ঈশ্বর-প্রাপ্তিরূপ নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি কাহাকে বলে, তাহা বঙ্কিম বাবু বুঝান নাই। এ জন্য বঙ্কিম বাবুর উপদিষ্ট অনুশীলন ধর্ম লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে।'

এ সমালোচনা আমার নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্কিম

চন্দ্র যে বৃত্তি সকলের স্ফূর্তি ও পরিণতির কথা বলিয়াছেন, ঐ বৃত্তি ত' ক্ষেত্রের নহে—ক্ষেত্রজ্ঞের। কারণ, আমরা দেখিয়াছি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবই সকল শক্তির উৎস। তা' ছাড়া আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় যে মোক্ষ, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সে মোক্ষ ঈশ্বরের সারূপ্যসিদ্ধি—"ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত স্বভাবপ্রাপ্তি"। তাই বলিতেছিলাম দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর সমালোচনা এ ক্ষেত্রে সমীচীন হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে আমার দুই একটা ক্ষুদ্র বক্তব্য আছে। তাহা বলিয়া এ আলোচনা সমাপ্ত করি। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, চেষ্টা করিলে সকলেই ধার্মিক হইতে পারে। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি বলিতে চাই, 'nurture' অপেক্ষা 'nature' বলবৎ। মালী যতই 'কর্ষণ' করুক না, আমড়া গাছে কোন দিন আম ফলাইতে পারিবে না। অনুশীলন কোনদিন গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিতে পারিবে না;—যে ঘোড়া হইয়া জন্মিয়াছে—সহিস 'ডলাই-মলাই' করিয়া তাহাকেই সবল ও সুশ্রী করিতে পারে। এখানেই স্বভাবের কথা উঠে। গীতার কথায় বলিতে হয়—প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি। তবে যাঁহারা আমার মত জন্মান্তর স্বীকার করেন, (বঙ্কিমচন্দ্রও জন্মান্তর মানিতেন) তাঁহারা বলিতে দ্বিধা করিবেন না যে, জন্মের পর জন্ম আন্তরিক পৌরুষ ও প্রযত্ন প্রয়োগ দ্বারা ঐ স্বভাবের পরিবর্তন করা যায়। ঐরূপে একদিন গাধা ঘোড়া হইতে পারে—কিতব সাধু হইতে পারে। এ প্রসঙ্গে 'স্ব-ধর্মে'র কথা উঠে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে কথা উঠাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' এবং অর্জুনকে স্বধর্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিয়াছেন।

স্বধর্মম্ অপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুম্ অর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥

—গীতা, ২।৩১

ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। অর্জুন মোহবশে সেই স্বধর্ম হইতে চ্যুত হইতেছিলেন, তাই বিশ্বগুরুর এই উপদেশ। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণ-চরিত্রে' লিখিয়াছেন—

'এই তস্করদিগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা করাকে কৃষ্ণ পরমধর্ম বিবেচনা করেন। আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজী নাম Justice; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism। উভয়েরই দেশীয় নাম স্বধর্মপালন'।

স্বধর্ম কি? সঙ্কীর্ণ অর্থে যাহাকে 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' বলে, তাহাই যে স্বধর্ম—এ কথা বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন—স্বধর্ম-শব্দ ব্যাপকার্থে গীতায় প্রযুক্ত হইয়াছে—কারণ, গীতার উপদেশ সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ নহে, সার্বভৌম। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—'ইহ জীবনে যে, যে কর্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বধর্ম।'

পুনশ্চ—'শক্তি ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বলিয়া অথবা আজীবন অভ্যস্ত বলিয়া স্বধর্মই লোকের অনুকূল। যিনি স্বধর্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য হইতে পারেন তিনিই ইহলোকে যথার্থ সুখী হয়েন। কিন্তু পরধর্ম অবলম্বন করিয়া, অর্থাৎ যাহা নিজের অনুষ্ঠেয় নয়—এমন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিলেও কেহ যে সুখী বা যশস্বী হইতে পারিয়াছেন এমন দেখা যায় না'। (গীতাভাষ্য ২১০-১ পৃষ্ঠা)

।

আমি কিন্তু গীতায় প্রযুক্ত 'স্বধর্ম' শব্দ আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি। স্বধর্ম অর্থে 'স্ব-ভাব'-নিয়ত কর্ম।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥—গীতা, ১৮।৪৭

'সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতে বিগুণ স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ। কেন না,—স্বভাব-নিয়ত কর্ম করিয়া কেহ কখন কিল্বিষভাগী হয় না।'

স্বভাব-নিয়ত কর্ম কি? স্ব-ভাব অর্থে স্ব স্ব প্রকৃতি। সকল মানুষের প্রকৃতি এক নয়—কেহ সত্ত্ব-প্রধান 'ব্রাহ্মণ' প্রকৃতি; কেহ সত্ত্ব-রজঃ-প্রধান 'ক্ষত্রিয়'-প্রকৃতি; কেহ রজঃপ্রধান 'বৈশ্য'-প্রকৃতি; আর কেহ তমঃ-প্রধান 'শূদ্র'-প্রকৃতি।* পৃথিবীর সর্বত্র এই চতুর্বিধ প্রকৃতির

* এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'গীতাভাষ্যে'র অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছেন—

জ্ঞান ও কর্ম মানুষের স্বধর্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুষ্ঠিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েই সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না—কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধর্ম স্থানীয় করেন, কেহ কর্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধর্ম স্বরূপ গ্রহণ করেন।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে। এজন্য জ্ঞানার্জন যাঁহাদিগের স্বধর্ম, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মন্ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কর্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্বিষয় আছে ও বহির্বিষয় আছে। অন্তর্বিষয় কর্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; বহির্বিষয়ই কর্মের বিষয়। সেই বহির্বিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হউক, অথবা সবই হউক, মানুষের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। যাহারা উৎপাদন করে তাহারা কৃষি ধর্মী; যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে তাহারা শিল্প বা বাণিজ্য ধর্মী; এবং যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধ ধর্মী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি?

লোক আছে—কি ভারতে কি অন্য দেশে। যে 'ব্রাহ্মণ'-প্রকৃতি, সর্বদেশে তাঁহার স্বধর্ম পালন; যে 'ক্ষত্রিয়'-প্রকৃতি, তাঁহার স্বধর্ম রক্ষণ; যে 'বৈশ্য'-প্রকৃতি, তাঁহার স্বধর্ম ধারণ; এবং যে 'শূদ্র'-প্রকৃতি, তাঁহার স্বধর্ম সেবন অতএব ঐ চতুর্বিধ প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকের চতুর্বিধ ধর্ম—কেহ পালক ও শিক্ষক, কেহ শাসক ও রক্ষক, কেহ পোষক ও ধারক এবং কেহ শ্রমিক ও সেবক। এই তত্ত্বই গীতাকার গীতায় বুঝাইয়াছেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্ গুণ-কর্ম বিভাগশঃ—৪।১৩

—এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই কথার বিস্তার করিয়া কাহার কি স্বধর্ম বা স্ব-ভাব-নিয়ত কর্ম, তাহার নির্দেশ করিয়াছেন—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ !
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈর্গুণৈঃ ॥—১৮।৪১

বঙ্কিমচন্দ্র গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের যে সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ—অধিকাংশ মনুষ্য চাতুর্বর্ণ্যের বাহির। তাহাদের কি স্বধর্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন ধর্ম বিহিত করেন নাই? ম্লেচ্ছেরা কি তাঁহার সন্তান নহে? ভগবদ্ধর্ম এমন অনুদার নহে।"

ঠিক কথা। প্রত্যেক মানুষেরই স্বধর্ম আছে, এবং কেহই চতুবর্ণের বাহিরে নহে—কি আর্য কি ম্লেচ্ছ। সেই স্বধর্ম তাহার স্বভাব-নিয়ত কর্ম—যে স্বভাব জন্ম-জন্মান্তরের ভাবনা বাসনা ও চেষ্টনার পুঞ্জীভূত সংস্কার বহন করিয়া ইহজন্মে তাহার 'প্রকৃতি'রূপে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। অতএব স্ব স্ব প্রকৃতির অনুসারেই প্রত্যেক জীবের 'স্বধর্ম'।

কিন্তু ইহার অপেক্ষাও গুরুতর কথা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ধর্ম-সাধনে সকল মানুষের পক্ষে একই ব্যবস্থা—অনুশীলন দ্বারা বৃত্তিসমূহের সমুচিত স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য। ইহা কতদূর সম্ভব বা সঙ্গত?

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, জীবে জীবে একটা অনাদিসিদ্ধ স্বারসিক বৈশিষ্ট্য (inborn temperamental difference) আছে —ঐ বৈশিষ্ট্য মৌলিক, বিধাতৃ-বিহিত, অনপনেয়। কেহ স্বভাবতঃ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ আনুষ্ঠানিক, কেহ ধ্যানরসিক, কেহ কলাবিৎ (কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী)। এ সম্বন্ধে আমার 'কর্মবাদ ও জন্মান্তরে' আমি এইরূপ লিখিয়াছি :—

যেমন সূর্যের শুভ্র জ্যোতিঃ কাচের দুলের (prism-এর) মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত হইলে 'সপ্ত সপ্তি'তে, seven prismatic colour-এ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতিঃ মায়া-উপাধির মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত হইয়া সপ্ত শ্রেণীর জীবে প্রকাশিত হয়েন। ইহাদিগকে Rays বা Archetypes বলে। এই সপ্ত শ্রেণীর নাম যথাক্রমে Philosophical, Scientific, Artistic, Devotional, Mystic, Ceremonial and Heroic। এই সপ্ত শ্রেণী বা Typeকে বিধাতার 'প্রকল্প' বলা যাইতে পারে।*

এভাবে দেখিলে—বৃত্তিসমূহের স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য নয়, প্রত্যেক জীবের পক্ষে স্বীয় 'প্রকল্প'-সিদ্ধিই (Achieving the Archetype) পরম পুরুষার্থ—ইহাই তাহার 'perfecting of his being'। এই মর্মে শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস লিখিয়াছেন :—

Man's purpose in life at his present stage is neither to be happy or miserable but to achieve his archetype.

---

* এই সপ্ত শ্রেণীকে থিয়সফিতে 'the Seven Rays' বলা হয়—First Ray, Second Ray, Third Ray ইত্যাদি।

মানুষের মধ্যে যে গোলাপ, সে নিজ গোলাপত্ব বর্জন করিয়া লিলি হইবার চেষ্টা করিবে না অথবা লিলি গোলাপ হইবার চেষ্টা করিবে না—অথবা যুগপৎ গোলাপত্ব ও লিলিত্ব অর্জন করিবার জন্য ব্যগ্র হইবে না। 'কাট'-গোলাপের উচিত 'বসরাই' গোলাপ হইবার চেষ্টা করা, অল্প-গন্ধ লিলির উচিত গন্ধরাজে বিকশিত হইবার চেষ্টা করা। ঐরূপ হইতে পারিলেই তাহার পক্ষে 'প্রকল্প'-সিদ্ধি হইল।

কথাটা আর একভাবে বলা যায়—আমি অন্যত্র সেই ভাবে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

আমরা জানি, জীব একাধারে কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা। জীবের অভ্যন্তর হইতে ত্রিবিধ শক্তি—কর্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি—যুগপৎ উৎসারিত হইতে দেখা যায়। কর্মশক্তি = Power of Action, যাহার প্রকাশ চেষ্টনায় (Conationএ) এবং যাহা উচ্চতর গ্রামে সন্ধিনীশক্তি (যে শক্তির ব্যঞ্জনা প্রতাপ বা Power); ইচ্ছাশক্তি = Power of Desire, যাহার প্রকাশ কামনায় (Emotionএ) এবং যাহা উচ্চতর গ্রামে হ্লাদিনী শক্তি (যে শক্তির ব্যঞ্জনা প্রেম বা Love); এবং জ্ঞান-শক্তি = Power of Thought, যাহার প্রকাশ ভাবনায় (Cognitionএ) এবং যাহা উচ্চতর গ্রামে সংবিৎশক্তি (যে শক্তির ব্যঞ্জনা প্রজ্ঞা বা Wisdom)।

যাঁহাদের কর্মশক্তি বেশ স্ফূর্ত আমরা তাঁহাদিগকে 'বীর' বলি—ইঁহারা Hero-type—যেমন জুলিয়স্ সিজার, শিবাজী, নেপোলিয়ন্ প্রভৃতি। কোন বাধাই ইঁহাদের বিমুখ করিতে পারে না—বিঘ্ন বিপত্তি ইঁহাদের ক্রিয়াশক্তিতে ইন্ধন সঞ্চার করে মাত্র। ক্রিয়াশক্তির নিম্ন গ্রামে যে শক্তির আভাস—সেই সন্ধিনী শক্তির বিস্ফূর্জিত মূর্তি বৈবস্বত মনু, নর নারায়ণ ঋষি এবং চরম পরম ভগবান্ সনৎকুমার—

উপনিষদে যাঁহাকে 'স্কন্দ' বলা হইয়াছে—যিনি সমস্ত শৌর্যবীর্যের সাকার মূর্তি।

যাঁহাদের ইচ্ছা শক্তি বেশ স্ফূর্ত—আমরা তাঁহাদিগের 'পীর' বলি—ইঁহারা Saint-type—যেমন বিল্বমঙ্গল, তুলসীদাস, রঘুনাথ, Suso, Meister Eckhart, মীরাবাঈ, করমেতি, মীনাক্ষী, সেণ্ট্ টেরেজা, সেণ্ট্ ক্যাথারিণ প্রভৃতি। ইঁহারা অধম কামকে উত্তম প্রেমে উত্তোলিত করেন, ইঁহারা 'God is love' এই মহান্ সত্য অনুভূতি দ্বারা জীবনে সফল করেন। ইঁহাদের নিকট ভগবান্ 'রসো বৈ সঃ', Dolche Amore (Sweetest love), দয়িত, বণিত, মাসুক (Beloved), পিতম্ (প্রিয়তম)—প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ। ইচ্ছাশক্তির নিম্নগ্রামে যে শক্তির আভাস, সেই হ্লাদিনী-শক্তির বিস্ফূর্জিত মূর্তি নারদ, মৈত্রেয়দেব, শ্রীচৈতন্য, ক্রাইষ্ট্ এবং চরম পরম মহাভাবময়ী শ্রীরাধা—যাঁহাতে মানবীয় প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত, যিনি হ্লাদিনীরসের ঘনীভূত রূপ।

যাঁহাদের জ্ঞানশক্তি বেশ স্ফূর্ত—আমরা তাঁহাদিগকে 'ধীর' বলি। ইঁহারা Sage-type—যেমন শঙ্কর, হেগেল্, প্লেটো, ডারউইন্, নিউটন্, আর্যভট্ট, সুশ্রুত প্রভৃতি। জ্ঞানশক্তির বিকাশে ইঁহাদের বুদ্ধি অত্যুচ্চে উঠিয়াছে এবং জগতে দর্শন-বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইঁহারা যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। জ্ঞানশক্তির নিম্ন গ্রামে যে শক্তির আভাস—সেই সম্বিৎ শক্তির বিস্ফূর্জিত মূর্তি ব্যাসদেব, যাজ্ঞবল্ক্য, পিথাগোরাস্, জারুথুস্ত্র এবং চরম পরম বুদ্ধদেব—যিনি সম্বোধি সিদ্ধ—যাঁহাতে বিজ্ঞান প্রজ্ঞানে পরিণত—যাঁহাতে সম্বিৎ-শক্তি অতিন্নী-প্রাপ্ত।

অতএব আমরা দেখিলাম জীবোত্তমেরা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত

—বীর, ধীর ও পীর—The Hero, The Sage, The Saint,*—কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত।

এই ত্রিবিধ সাধকের অনুসারে সাধনারও ত্রৈবিধ্য—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ †। এ সম্পর্কে আমি আমার ঐ 'God as Love'—প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছি—

Now, God being a Trinity with the triple aspects of *Power*, *Wisdom* and *Bliss*,—Man, who is made in His image, is also triune. The sparks, emanated from the Divine Flame, (spoken of in Theosophy as Monads) are essentially *Sat*, *Chit* and *Ananda* and their destiny is, sooner or later, to be fanned into flames—fully evolving their latent potentialities of *Power*, *Wisdom* and *Love*—until they, Gods in the becoming, actually become Gods. To achieve this destiny, and in order that the

* এই তিন শ্রেণীর সহিত আমরা পূর্বে যে সপ্ত রশ্মির (Seven Rays-এর) কথা বলিলাম তাহার সম্বন্ধ কি ? একথা আমি আমার 'God as Love' প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

The Hero, as we know, belongs to the 1st ray—the ray of power and to the 7th, the ceremonial. The sage is temperamentally either a philosopher or a scientist and so belongs to the 2nd and the 3rd ray. And the saint, who is artistic, mystical, devotional, is affiliated to the 4th, 5th and 6th rays.

† এই ত্রিধারা আরম্ভে ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইলেও অবসানে সম্মিলিত হইয়া এক অপূর্ব ত্রিবেণী-সঙ্গম রচনা করে।

unfoldment may be harmonious and not lopsided, Man has appropriately evolved a threefold technique of approach to God—the three well-known paths of *Action, Intellection* and *Devotion—Karma, Jnanam* and *Bhakti*, to be trodden successively, if not simultaneously—the first being mainly the line of approach for the heroic temperament, the second for the philosophic and the third for the devotional—the three archetypes being the *Hero*, the *Sage* and the *Saint*.

যে যুক্ত-ত্রিবেণী রচনার কথা বলিলাম, ভগবদ্গীতা তাহার প্রয়াগ-ক্ষেত্র—এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সে কথার আলোচনা করিব।

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ও ভগবদ্‌গীতা

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মজীবনে ভগবদ্‌গীতার বিশিষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। মহাভারত-ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত এই ভগবদ্‌গীতার সম্পর্কে প্রাচীনেরা বলিতেন—গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিম্ অন্যৈঃ শাস্ত্র-বিস্তরৈঃ। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই গীতাকে সুগীতা করিয়াছিলেন—প্রাচীন বয়সে তিনি সতত গীতা পাঠ করিতেন, গীতার অধিকাংশ শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল—বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, মৃত্যুশয্যায় শুইয়া তিনি একান্ত মনে গীতার আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র গীতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তিনি একাধিক স্থলে ভগবদ্‌গীতাকে জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়াছেন।* "ঈশ্বর জানিব কিসে?" এ প্রশ্নের তিনি উত্তর দিয়াছেন—'হিন্দু শাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে—প্রধানতঃ গীতায়'। (ধর্মতত্ত্ব, পঞ্চদশ অধ্যায়)।

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ সাহিত্যিক অবদান—তৎপ্রণীত গীতাভাষ্য। ঐ গীতাভাষ্য ১২৯৩ বঙ্গাব্দের 'প্রচারে' প্রকাশিত হইতে সুরু হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ভাষ্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই—উহা চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের কয়েক বৎসর পরে—১৩০৯ ভাদ্র মাসে উহা

* ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলন (অষ্টাদশ অধ্যায়) ও দেবী চৌধুরাণী (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)।

গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ঐ ভাষ্যের এক স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র গীতোক্ত ধর্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্বব্যাপক ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই।" ইহার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে'র 'খ' ক্রোড়পত্রে লিখিয়াছিলেন—'যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকার। ভগবদ্‌গীতার উক্তি ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি কোন মনুষ্যপ্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়।" "এমন আশ্চর্য ধর্ম, এমন সত্যময় উন্নতিকর ধর্ম জগতে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই।" (ধর্মতত্ত্ব, ষোড়শ অধ্যায়)।

বঙ্কিমচন্দ্র এ কথাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার ব্যাখ্যাত যে অপূর্ব অনুশীলনতত্ত্ব *—স্বদেশবাসীর অভ্যুদয়কল্পে যাহা তাঁহার অমূল্য দান—ঐ 'অনুশীলনতত্ত্ব' গীতার নূতন ব্যাখ্যা মাত্র †—কারণ, তাঁহার মতে "ভগবদ্‌গীতায় যে পরম পবিত্র অমৃতময় ধর্ম কথিত, ঐ ধর্ম অনুশীলনের উপরই প্রতিষ্ঠিত" (ধর্মতত্ত্ব, প্রথম অধ্যায়)।

গীতা কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজোক্তি—যা সাক্ষাৎ পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ বিনিঃসৃতা? এ প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য বলেন—তং ধর্মং ভগবতা

---

* 'The substance of Religion is culture—the fruit of it the higher Life'—আচার্য সীলির এই উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি favourite quotation ছিল।

† ধর্মতত্ত্ব—ষোড়শ অধ্যায়।

যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈঃ উপনিববন্ধ অর্থাৎ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে যে ধর্ম উপদেশ করিয়াছিলেন, সর্বজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাস (যোগধারণার দ্বারা তাহা ধারণ করিয়া) সাত শত শ্লোকে গীতায় তাহা গ্রথিত করিয়াছেন। অতএব শঙ্করের মতে, গ্রন্থন-কার্য বেদব্যাসের এবং যে উপদেশ গ্রথিত হইয়া গীতাগ্রন্থে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীকৃষ্ণ তো আর যুদ্ধক্ষেত্রে অনুষ্টুভ ছন্দে শ্লোক রচিয়া অর্জুনের 'কশ্মল' অপনোদন করেন নাই—বিশেষতঃ যখন দেখা যায়, গীতার সাত শত শ্লোকের মধ্যে সঞ্জয়ের উক্তি ৪৫টি শ্লোক, ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি ১টি শ্লোক, অর্জুনের উক্তি ৮৪টি শ্লোক এবং বাকী ৫৭০টি শ্লোক মাত্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে স্থাপিত।

শঙ্করাচার্যের উত্তর শুনিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর কি? "শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জুনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এই সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। না বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত এ কথাও বলা যাইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ যে গীতোক্ত ধর্মের সৃষ্টিকর্তা, তাহা আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।" * কি কারণ? বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' তাহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"এমন বিচার উঠিতে পারে যে, গীতায় যে ধর্ম কথিত হইয়াছে তাহা গীতাকার কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম কৃষ্ণ-প্রচারিত, কি গীতাকারপ্রণীত, তাহার স্থিরতা কি? সৌভাগ্যক্রমে আমরা গীতাপর্বাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষ্ণদত্ত

---

* ধর্মতত্ত্ব—ষোড়শ অধ্যায়

ধর্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমরা দেখি যে, গীতায় যে অভিনব ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহার মধ্যে একতা আছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, এই ধর্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই বটে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে, মহাভারতকার যে ধর্ম-ব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহা সর্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম, যদি পুনশ্চ দেখি যে, সেই ধর্ম প্রচলিত ধর্ম হইতে ভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম; তবে বলিব এই ধর্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে, গীতায় যে ধর্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ কৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্মের সঙ্গে ঐক্য আছে, উহা তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে গীতোক্ত ধর্ম যথার্থই কৃষ্ণ-প্রণীত বটে।" (কৃষ্ণ চরিত্র ৫ম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। এই সকল কথা নিপুণভাবে প্রতিপন্ন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ঐ খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে বলিতেছেন—"যে নিষ্কাম ধর্ম আমরা গীতায় পড়ি, তাহা এখানেও আছে; এইরূপ অতি মহৎ ধর্মোপদেশেই কৃষ্ণচরিত্র বিশেষ স্ফূর্তি পায়।"

এই ধর্মোপদেশকে লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপসংহারে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণকথিত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত, সর্বলোকহিতকর সর্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখনও পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই।—এই ধর্মে যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহা প্রায় মনুষ্যাতীত।"

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"যাহা আমরা ভগবদ্গীতা বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণ-প্রণীত নহে। উহা ব্যাস-প্রণীত বলিয়া খ্যাত—"বৈয়াসিকী সংহিতা" নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া

রাখিয় ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্ম্মমতের সঙ্কলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্তৃক উহা এই আকারে সঙ্কলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়"। (কৃষ্ণচরিত্র, ৪র্থ খণ্ড—নবম অধ্যায়)

পুনশ্চ—"আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ভগবদুক্তি এমন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে। আমি বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকথিত ধর্ম অন্য কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। যিনি সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহার নিজের মতামত অবশ্য ছিল। তিনি যে নিজসঙ্কলিত গ্রন্থে কোথাও নিজের মত চালান নাই, ইহা সম্ভব নহে। শ্রীধর স্বামীর ন্যায় টীকাকারও সঙ্কলনকর্তা সম্বন্ধে "প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকান্ অলিখৎ"—ইহা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, "কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে ব্যরচৎ।" (গীতাভাষ্য, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

প্রচলিত গীতা 'কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ' (সংবাদ =কথোপকথন, Dialogue)। এই 'সংবাদ'কে লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন—"বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভসময়ে কৃষ্ণার্জুনে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মের সার মর্ম সঙ্কলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

"যুদ্ধে প্রবৃত্তিসূচক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিতেছেন, তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই আছে। অন্যান্য অধ্যায়েও "যুদ্ধ কর" এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্ মধ্যে মধ্যে আপনার বাক্যের উপসংহার করেন বটে, কিন্তু সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্তব্যতার বিশেষ

কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ হয় যে, যে কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অনুভূত করিতে না পারেন, এইজন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা যুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মনুষ্যধর্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

"এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয় পাঠক মনে মনে বুঝিবেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া কৃষ্ণার্জুনে যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। দুই পক্ষের সেনা ব্যূহিত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত, সেই সময়ে যে একপক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ম শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না।"—গীতাভাষ্য, ২৯-৩০ পৃষ্ঠা।

এ সম্পর্কে আমার কিছু ব্যক্তব্য আছে—সংক্ষেপে বলিতে চাই। এক্ষণে আমরা যে মহাভারত প্রাপ্ত হই, উহা উগ্রশ্রবাঃ সৌতির মহাভারত। এ মহাভারত প্রায় একলক্ষ শ্লোকাত্মক—

একং শতসহস্রন্তু ময়োক্তং বৈ নিবোধত—আদি, ১।১০৯

ইদং শতসহস্রং হি শ্লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্।

সত্যবত্যাত্মজেনেহ ব্যাখ্যাতম্ অমিতৌজসা॥—আদি, ৬২।১৪

সেই জন্য এ মহাভারতের নাম 'শতসাহস্রী সংহিতা'।

আদি পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই মহাভারতের একটি পর্বসংগ্রহ আছে—ভারতস্যেতিহাসস্য শ্রূয়তাং পর্বসংগ্রহঃ

(পর্বসংগ্রহ = Table of Contents)।

সংগ্রহকার বলিতেছেন—ভীষ্মপর্বের চারিটি উপপর্ব বা পর্বাধ্যায় (sections)—জম্বুখণ্ডপর্ব, ভূমিপর্ব, ভগবদ্গীতাপর্ব ও ভীষ্মবধপর্ব। * ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায়ে কি আছে ?

কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ।
মোহজং নাশয়ামাস হেতুভিঃ মোক্ষদর্শিভিঃ ॥—২।২৪৬

'এই পর্বাধ্যায়ে মোক্ষদর্শী হেতু প্রদর্শন করিয়া মহামতি বাসুদেব পার্থের মোহজ কশ্মল নাশ করিতেছেন'। ('কশ্মল' শব্দটি আমাদের লক্ষ্যের বিষয়; কশ্মলের অর্থ অবসাদ—গীতায় অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণবাক্য স্মরণ করুন—কুতঃ ত্বা কশ্মলম্ ইদং বিষমে সমুপস্থিতম্)। অতএব ভগবদ্গীতা যে সৌতির মহাভারতের অঙ্গীভূত ছিল, ইহা নিঃসংশয়, বিশেষতঃ যখন দেখিতে পাই—অনুশাসন ও শান্তি পর্বে এই গীতার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্মৃধে।
অর্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ম্ ॥

—শান্তিপর্ব, ৩৪৮।৮

সৌতি বলেন, মহাভারতের আদিম স্তর—ভারতসংহিতা—যাহার নাম ছিল 'জয়' (জয়াখ্যং ভারতং মহৎ—স্বর্গপর্ব, ৫।৪৯)। বেদব্যাস তিন বৎসর 'সদোত্থায়ী' (একনিষ্ঠ) হইয়া এই ভারত আখ্যান রচনা করেন।

ত্রিভির্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভারতম্ আখ্যানং কৃতবান্ ইদম্ অদ্ভুতম্ ॥—আদি, ৬১।৫২

এই ভারতসংহিতা ২৪,০০০ শ্লোকাত্মক ছিল।

চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।—আদিপর্ব, ১।১০২

* পর্বোক্তং ভগবদ্গীতাপর্ব ভীষ্মবধস্ততঃ।

উহা ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়-সংবাদরূপে রচিত হইয়াছিল। এই ভারতসংহিতা পাণ্ডুর দিগ্বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া (পাণ্ডুর্জিত্বা বহূন দেশান্ যুধা চ বিক্রমেণ চ) দুর্যোধন-বধরূপ পাণ্ডব বিজয়ে পরিসমাপ্ত ছিল (সেই জন্য ইহার নাম ছিল 'জয়')।

ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন গুরুর আজ্ঞায় অর্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয়ের সর্পসত্রে ঐ ভারতসংহিতা পরিবর্ধিত করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। ইহাই মহাভারতের দ্বিতীয় স্তর—বৈশম্পায়ন-জনমেজয়-সংবাদ। এইরূপে ভারতসংহিতা মহাভারতে রূপান্তরিত হয়।

জনমেজয় প্রশ্ন করিতেছেন—

কথং সমভবদ্ ভেদস্তেষাম্ অক্লিষ্টকর্মণাম্।
তচ্চ যুদ্ধং কথং বৃত্তং ভূতান্তকরণং মহৎ॥

উত্তরে বৈশম্পায়ন বলিতেছেন—

শৃণু রাজন্! যথা ভেদঃ কুরুপাণ্ডবয়োরভূৎ।
রাজ্যার্থে দ্যূতসম্ভূতো বনবাসস্তথৈব চ॥
যথা চ যুদ্ধম্ অভবৎ পৃথিবীক্ষয়কারকম্।
তত্তেঽহং কথয়িষ্যামি পৃচ্ছতে ভরতর্ষভ!॥

—আদিপর্ব, ৬১।৪-৫

তখনও মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত হয় নাই। উহা একশত অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল।

এতৎ পর্বশতং পূর্ণং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা—২।৮৩

জনমেজয়ের সর্পসত্রের অনেক পরে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, ঐ যজ্ঞে লোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতি সমবেত ঋষিমণ্ডলীকে বৈশম্পায়নের মহাভারত শুনাইয়াছিলেন। তাঁহারই হস্তে মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত হয়।

যথাবৎ সূতপুত্রেণ লোমহর্ষণিনা ততঃ।
উক্তানি নৈমিষারণ্যে পর্বাণ্যষ্টাদশৈব তু ॥

—আদিপর্ব, ২।৮৪

এই সৌতিকৃত মহাভারতই প্রচলিত মহাভারত। অনেকদিন পর্যন্ত ভারতসংহিতা ও মহাভারত পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-শতকে রচিত আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে এই সূত্রটি দৃষ্ট হয়—পৈল-সুমন্ত-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-সূত্রভাষ্য-ভারত-মহাভারতধর্মাচার্যাঃ যে চান্যে আচার্যাস্তে সর্বে তৃপ্যন্তু।—গৃহ্যসূত্র, ৩।৪

কাহার তর্পণ করিতে হইবে—ইহার উত্তরে আশ্বলায়ন বলিতেছেন,—"বেদের সংহিতাকর্তা পৈল জৈমিনি সুমন্ত ও বৈশম্পায়ন এবং ভারত-(সংহিতা)-কর্তা এবং মহাভারতকর্তা এই সকল আচার্যের তর্পণ করিতে হইবে।"

আমরা দেখিয়াছি, ভগবদ্গীতা সৌতির মহাভারতের অঙ্গীভূত ছিল। গীতা যে বৈশম্পায়নের মহাভারতেরও অঙ্গীভূত ছিল-এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন এই—আদিম ভারত-সংহিতায় গীতা ছিল কি না, এবং যদি ছিল, কি আকারে ছিল? আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ নামে যে প্রসঙ্গ আছে, তাহার একটি শ্লোক এই—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥—১।১৪৩

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নিপুণভাবে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ঐ ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ চব্বিশহাজার শ্লোকাত্মক

মহাভারতের সূচিপত্র। উহার আরম্ভ ছিল অর্জুনের লক্ষ্যভেদ হইতে এবং শেষ ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত। অতএব দেখা যাইতেছে, ভারতসংহিতায় গীতার যাহা প্রধান ঘটনা—শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। এই বিশ্বরূপ বর্ণনা লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' লিখিয়াছেন—"মহাভারতের ভীষ্ম-পর্বের ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায়ে (তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক) বিশ্বরূপ-প্রদর্শন বর্ণিত আছে—গীতার একাদশের বিশ্বরূপ বর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা; সাহিত্য-জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইলে এমন আর কিছু পাওয়া দুর্লভ"।

এই সম্বন্ধে একবার বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমার আলাপের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। সে প্রায় ৪৫ বছরের কথা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রের বঙ্কিমসংখ্যায় আমি ঐ আলাপের বিবরণ দিয়াছিলাম। কৌতূহলী পাঠক এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে তাহা পাঠ করিতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কথার সার এই ছিল যে, আদিম গীতার শেষ হইয়াছিল ঐ বিশ্বরূপ-প্রদর্শনে এবং পরবর্তী কালে গীতার অবশিষ্ট অধ্যায়গুলি সংযুক্ত করা হইয়াছে। এ মত যে সম্পূর্ণ সমীচীন, তাহা আমার বোধ হয় না। কেন বোধ হয় না, তাহা আমি ঐ 'নারায়ণ' পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম। তবে এ কথা ঠিক যে, ভারতসংহিতার অন্তর্গত যে গীতা—যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে—এই শ্লোকে যে গীতার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে—সে গীতা 'কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে' এই বিশ্বরূপ-প্রদর্শনেই অবসিত ছিল। বিশ্বরূপ দেখিয়া যদি অর্জুনের মোহজ কশ্মল বিদূরিত না হয়, তবে তাঁহার নিকট ক্ষরাক্ষর-যোগ ও গুণত্রয় বিভাগ ইত্যাদি বর্ণন করা একেবারে ব্যর্থ নয় কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার ধর্ম

আমরা দেখিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র ভগবদ্‌গীতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন গীতাই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গীতা-ভাষ্যের একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন—'এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্বব্যাপক ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই।' 'ধর্মতত্ত্বে' প্রকাশিত তাঁহার এ সম্পর্কে অভিমত এই :—'যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে ভগবদ্‌গীতায়।' 'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপসংহারে গীতোক্ত ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—'কৃষ্ণকথিত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত সর্বলোক-হিতকর সর্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। ঐ ধর্ম যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহা প্রায় মনুষ্যাতীত।' এ সকল খুব উচ্চ প্রশংসা—স্তুতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা কতটা সঙ্গত, সত্যোপেত ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে গীতা-ধর্ম বুঝিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হয়। ধর্ম কি ? 'ধারণাৎ ধর্ম উচ্যতে'—যাহা মনুষ্যকে 'ধারণ' করিতে পারে, পুষ্ট করিতে পারে, পীন করিতে পারে, তৃপ্ত করিতে পারে, চরম শ্রেয়ের পথে চালিত করিয়া 'নিঃশ্রেয়সে' (যাহাকে Summum Bonum বলে) নীত করিতে পারে—তাহাই ধর্ম। গীতোক্ত ধর্ম কি এই সকল লক্ষণাক্রান্ত ?

জীবের পরম চরম লক্ষ্য ঐ নিঃশ্রেয়স—যাহার অপর নাম 'মুক্তি'।

মুক্তি" কি? গীতাভাষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—'জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হওয়াই মুক্তি'। * * 'ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ। ব্রহ্মকে জানিতে হইবে—কিন্তু ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম নিরাকার, নিরঞ্জন, অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য শুদ্ধ মুক্ত—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। এই ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তি-লাভ হয়।'

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ

এ মুক্তি নির্বাণ মুক্তি—বৈদান্তিক যাহাকে 'বিদেহ কৈবল্য' বলেন। নদী যেমন সমুদ্রে মিশ্রিত হইয়া নামরূপ হারাইয়া একাকার হয়—সেই একাকার অবস্থা—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়—উপনিষদ্

'এ মুক্তি সুখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোৎকর্ষ' (ধর্মতত্ত্ব, ২য় অধ্যায়)—উপনিষদ্ যাহাকে 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য', গীতা যাহাকে 'অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে' বলিয়াছেন—বুদ্ধদেব যাহাকে 'পামোজ্জবহুলং' বলিতেন। 'ধর্মতত্ত্বে'র চতুর্থ অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—"ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরে লীন হইব—ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়—ঐশ্বরিক আদর্শনীত স্বভাব-প্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।" 'কৃষ্ণচরিত্রে' পাপপুণ্য প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'পাপপুণ্য কি? যাহার দ্বারা জগদীশ্বরের সন্নিধিতে উপস্থিত হইতে পারি—তাহাই পুণ্য, তাহাই ধর্ম;—তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই পাপ, তাহাই অধর্ম।' *

* যাহাকে 'Problem of Sin' বলে, অর্থাৎ ভগবান্ যখন পুণ্যময়, পুণ্যই যখন তাঁহার অভিপ্রেত—তখন পৃথিবীতে পাপ আসিল কোথা হইতে? বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে'

কিন্তু নির্বাণ-মুক্তি ছাড়া আর এক প্রকার মুক্তি আছে যাঁহার নাম 'নির্মাণ-মুক্তি'। এ অবস্থায় মুক্ত জীব 'নির্মাণকায়ম্ অধিষ্ঠায়' (অপ্রাকৃত দেহ অবলম্বন করিয়া) ঈশ্বরের সহিত মিলিত থাকে, নামরূপ হারাইয়া মিশ্রিত হয় না—জলস্তম্ভে জলদ যেমন জলধির সহিত মিলিত হয়, মিশ্রিত হয় না। যাহাকে আমরা 'জীবন্মুক্তি' বলি, ঐ জীবন্মুক্তি এই নির্মাণ-মুক্তিরই পূর্বরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারামে' লিখিয়াছেন— 'ইহলোকেই মুক্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ ও দুঃখের অতীত, সে ইহলোকেই মুক্ত।' পুনশ্চ—'নিষ্কাম কর্মীই মুক্তির অধিকারী। মনুষ্য নিষ্কাম না হইলে ঈশ্বরে মিলিত হইতে পারে না' (গীতাভাষ্য, ২৩৯ পৃষ্ঠা)। 'মুক্ত ব্যক্তির সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া সামঞ্জস্যযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সে 'মুক্ত'—এক কথায় অনুশীলনের পূর্ণ মাত্রায় মোক্ষ' (ধর্মতত্ত্ব)।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন—'মোক্ষ আর কিছুই নয় ঐশ্বরিক আদর্শনীত স্বভাবপ্রাপ্তি'। ইহাকেই গীতায় ভগবান্ 'মম সাধর্ম্যম্ আগতঃ' বলিয়াছেন—এই 'similitude of God'-কে খৃষ্টানেরা 'Deification,' বলেন, ('when He and I become one'—Eckhart), আমরা এ দেশে 'ব্রহ্মসারূপ্য' বলি। কি উপায়ে জীব ব্রহ্মের স-রূপ' হইতে পারে? 'ঐশ্বরিক আদর্শনীত স্বভাব প্রাপ্ত' হইতে পারে? আমরা

এ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন—'খৃষ্টানের পক্ষে এ তত্ত্বের মীমাংসা বড় কষ্টকর, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে তাহা সহজ। হিন্দুর মতে ঈশ্বরই জগৎ। তিনি নিজে সুখ-দুঃখ, পাপপুণ্যের অতীত। আমরা যাহাকে সুখ দুঃখ বলি, তাহা তাঁহার কাছে সুখ দুঃখ নহে, আমরা যাহাকে পাপপুণ্য বলি, তাহা তাঁহার কাছে পাপপুণ্য নহে। তিনি লীলার জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—তাঁহারই অংশ।'

জানি, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ—তিনি একাধারে প্রতাপঘন, প্রজ্ঞাঘন, ও প্রেমঘন—'the glorious Trinity of Power, Wisdom and Love'—যুগপৎ 'Life, Light and Love'—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির বিস্ফূর্জিত মূর্তি। জীব যখন ব্রহ্মের অংশ (মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা), ব্রহ্ম-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ (যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ব্যুচ্চরন্তি সহস্রশঃ), ব্রহ্মের প্রতিচ্ছবি (God made man in His own image—Bible)—তখন জীবের অভ্যন্তরেও ঐ সচ্চিদানন্দ ভাব, ঐ প্রতাপ, প্রজ্ঞা, প্রেম বিস্ফূর্ত না হইলেও অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান আছে—

সত্যংজ্ঞানম্ অনন্তঞ্চ হ্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী

যাহাকে আমরা ধর্ম বলি, তাহার লক্ষ্য জীবের ঐ অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ ভাব সুব্যক্ত করা—ঐ অস্পষ্ট প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেমকে বিস্ফূর্জিত করা। যে জীবে ঐ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত, ঐ সচ্চিদানন্দ ভাব মহোজ্জ্বল,—তিনিই 'ঐশ্বরিক আদর্শনীত স্বভাব-প্রাপ্ত', তিনিই ব্রহ্মের সারূপ্যসিদ্ধ—তিনিই মুক্ত।

জীব কিরূপে মুক্ত হইবে? জীব কিরূপে ব্রহ্ম হইবে? প্রণালী-শুদ্ধ সাধনা দ্বারা। এ প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র লিখিয়াছি—'সাধনাদ্বারা জীবের মধ্যে অব্যক্ত সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব—অব্যাকৃত সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি সুব্যক্ত করিতে পারিলে—তবেই জীব ব্রহ্ম হইবে—তবেই জীব বুঝিতে পারিবে 'তত্ত্বমসি'—তবেই জীব বলিতে পারিবে—'সোহং' 'চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং'। এইরূপ সাযুজ্যসিদ্ধির জন্য কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—একশঃ কোন মার্গই যথেষ্ট নয়। পরমাত্মার যে চিদ্‌ভাব—জীবের বিজ্ঞানময় কোশের সাহায্যে যাহার আংশিক প্রকাশ হয়—জ্ঞানযোগদ্বারা তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন

করিতে হইবে ; পরমাত্মার যে আনন্দভাব—জীবের আনন্দময় কোশের সাহায্যে যাহার আংশিক প্রকাশ হয়—ভক্তিযোগদ্বারা তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে ; এবং পরমাত্মার যে সৎভাব—জীবের হিরণ্ময় কোশের সাহায্যে যাহার আংশিক প্রকাশ হয়—কর্মযোগের দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে। অর্থাৎ জীবকে একাধারে বীর, পীর ও ধীর (Hero, Saint and Sage) হইতে হইবে। এইরূপে যখন জীবের সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দভাব পূর্ণ বিকশিত হইবে, যখন তাহার মধ্যে অর্ধব্যক্ত প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত হইবে, তখন জীব আর জীব থাকিবে না, শিব হইবে। তখন সে যজুর্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিবে—যোঽ-সাবসৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি—ক্রাইষ্টের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারিবে—I and my Father are one.

এই যে মুক্তি বা ভগবানের 'সাধর্ম্য'-প্রাপ্তি—তাহার জন্য ত্রিবিধ technique—কর্ম, জ্ঞান, ও ভক্তির প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতে এই ত্রিধারা ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত ছিল। কর্মবাদী বলিতেন, সংসার-তরণের, মোক্ষসাধনের একমাত্র উপায় কর্ম—

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ অনার্থক্যং অতদর্থানাম্

—মীমাংসা সূত্র, ১।২।১

অন্য পক্ষে জ্ঞানবাদী বলিতেন—জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ—মুক্তির একমাত্র উপায় জ্ঞান।

কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ জ্ঞানাদেব প্রমুচ্যতে

ওদিকে ভক্তিবাদী বলিতেন, ভক্তিরেব গরীয়সী—জ্ঞান-গন্ধহীন, কর্মদ্বারা অনাবৃত নগ্ন ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট পন্থা—

ভক্ত্যাহম্ একয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্—ভাগবত

গীতায় কিন্তু বিশ্বগুরু যুগপৎ কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির উপদেশ দিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 'All mystic ways (কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি) are equal—all are equally roads to God'—শুধু তাই নহে, শ্রীভগবান্ সমন্বয়ের উচ্চ চূড়ায় আরূঢ় হইয়া ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জীবের ব্রহ্মসারূপ্যলাভের জন্য কেবল কর্ম, কেবল জ্ঞান, কেবল ভক্তি পর্যাপ্ত নয়—জীবকে ব্রহ্মে বিকশিত হইতে হইলে এ মার্গ-ত্রয়কেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হয়। সেইজন্য গীতায় দেখি কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্ভুত যুক্ত-ত্রিবেণী-সঙ্গম রচনা করিয়াছেন—যে পুণ্যতর কল্যাণতর ত্রিবেণীতে সরস্বতীর কর্মধারা, যমুনার জ্ঞানধারা এবং গঙ্গার ভক্তিধারা সমান উজ্জ্বল, সমস্রোতে বহমান! বঙ্কিমচন্দ্র কি এই পুণ্যসঙ্গমে কোনদিন স্নান করিয়াছিলেন ?

স্বীকার করি, কর্মযোগের উপর তাঁহার বেশ পক্ষপাত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারামে' বলিয়াছেন—'যত প্রকার মনুষ্য আছে, রাজর্ষিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'। সেইজন্য সংসারত্যাগিনী দেবী চৌধুরাণী প্রফুল্ল-মুখীকে গৃহে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে যথার্থ সন্ন্যাসিনী করিয়াছেন। 'তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্ম-পরায়ণ—তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী।' পুনশ্চ—'ফল যাহাই হউক, যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা অবশ্য কর্তব্য। করিলে সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি অলাভ হইবে—তাহা বিবেচনা করা কর্তব্য নহে—সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ (গীতা, ২।৩৮)। ইহাই পশ্চাৎ কর্মযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে।' (গীতাভাষ্য, ১১০)

অর্থাৎ, নিষ্কাম হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম করিতে হইবে—তবেই কর্ম কর্মযোগে উন্নীত হইবে। 'অনুষ্ঠেয় যে কর্ম—অনাসক্ত হইয়া ফলত্যাগ পূর্বক তাহার নিয়ত অনুষ্ঠান করিলেই কর্মত্যাগ হইল—নচেৎ হইল না। ইহাই কর্মযোগ'। (সীতারাম)

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় !
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥

—গীতা, ২।৪৮

ইহারই ভাষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন--'পূর্বশ্লোকে ফলাকাঙ্খাশূন্য যে কর্ম, তাহাই বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে সেইরূপ কর্ম করার পক্ষে তিনটি বিধি নির্দিষ্ট হইতেছে—

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম করিবে। দ্বিতীয়, সঙ্গত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে। তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তুল্য জ্ঞান করিবে।' (গীতাভাষ্য, ১৪৭)

পক্ষান্তরে 'আনন্দমঠে'র শেষ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র সত্যানন্দের গুরু চিকিৎসকের মুখ দিয়া বলিতেছেন—'প্রকৃত হিন্দু ধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে, অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্মও লোপ পাইয়াছে।'

আবার দেখিতে পাই—'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র ভক্তির প্রস্তুতি করিতেছেন (ধর্মতত্ত্ব ১৪ হইতে ১৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

'ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং অনুশীলনের একমাত্র সেই উদ্দেশ্য ভক্তি। × × ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। অতএব

ভক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়। ×× একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ×× যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বর-মুখী বা ঈশ্বরাবর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। ×× যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে সে ভক্ত নহে।'

এখন প্রশ্ন এই—যাহাকে আমি গীতার ত্রিবেণী বলিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সন্ধান পাইয়া ছিলেন কি না? যদি না পাইয়া থাকেন, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের গীতানুশীলন অসম্পূর্ণ ছিল বলিতে হইবে। তাঁহার গীতাভাষ্য ও ধর্মতত্ত্ব একটু নিবিষ্টভাবে পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ত্রিবেণীর কেবল ইঙ্গিত নয়, বিস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। 'পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাকে Thought, Action and Feeling বলিয়াছেন—ঐ তিনকেই ঈশ্বরমুখ করা যাইতে পারে। Thought ঈশ্বরমুখ হইলে জ্ঞানযোগ; Action ঈশ্বরমুখ হইলে কর্মযোগ; এবং Feeling ঈশ্বরমুখ হইলে ভক্তিযোগ'। (গীতাভাষ্য, ১১২)। 'শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন, (জ্ঞান ভিন্ন) ধর্মের অন্যপথও আছে; অধিকারিভেদে তাহা জ্ঞানাপেক্ষা সুসাধ্য। পরি-শেষে ইহাও দেখিয়াছিলেন অথবা দেখাইয়াছেন, জ্ঞান মার্গ এবং অন্য মার্গ পরিণামে সকলই এক। এই কয়টি কথা লইয়া গীতা।'

এখানে আমরা ত্রিবেণীর ইঙ্গিত পাইলাম। এইবার সামঞ্জস্যের স্পষ্ট আভাস অন্বেষণ করি। এই যে ত্রিমার্গ—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—গীতায় 'তাহাদের সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে'।

জ্ঞান ও কর্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—'প্রকৃত জ্ঞান কি? যে জ্ঞানের দ্বারা জীব সমুদয় ভূতকে আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পায়—

যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি

—গীতা, ৪।৩৫

বলা বাহুল্য, এ জ্ঞান পাণ্ডিত্য (Pedantry) নহে—তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য (উপনিষদ্)—এ জ্ঞান Head-learning নহে, Soul-wisdom (প্র-জ্ঞান)। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

'কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধন সম্পূর্ণ হয় না। জ্ঞান ও কর্ম—উভয়ের সংযোগ চাই। কেবল কর্মে হইবে না, কেবল জ্ঞানেও নহে। * * উভয়েরই সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই।* * এইরূপে কর্মবাদের ও জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে ধর্মপ্রণেতৃশ্রেষ্ঠ ভূতলে মহামহিমানয় এই নূতন ধর্ম প্রচারিত করিলেন।'

কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য কি ?

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥—গীতা, ৩।৩০

অর্থাৎ, বিবেকবুদ্ধিতে কর্মসকল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া, মমতা ও বিকারশূন্যভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হও। 'কর্ম ঈশ্বরের, আমি তাঁহার ভৃত্যস্বরূপ—এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম করিবে—অহং কর্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা (শঙ্কর)। তাহা হইলেই কর্মযোগ সিদ্ধ হইল। * * ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যে কর্ম, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম বন্ধন মাত্র (অনুষ্ঠেয় নহে); অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্মই করিবে। ইহার ফল দাঁড়ায় কি ? দাঁড়ায় যে, সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী করিবে, নহিলে সকল কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম হইবে না। এই নিষ্কাম ধর্মই নামান্তরে ভক্তি। এইরূপে কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য হইল।'

জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য কি ?

গীতা জ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন—

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী—১৩।১০

এবং চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

'ভক্তির সঙ্গে ইহার ঐক্য ও সামঞ্জস্য দেখিলে। এই অপূর্ব তত্ত্ব, অপূর্ব ধর্ম কেবল গীতাতেই আছে। এরূপ আশ্চর্য ধর্মব্যাখ্যা আর কখন কোন দেশে হয় নাই।'

গীতোক্ত ধর্ম কি Asceticism ? Asceticism-এ ইন্দ্রিয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ। গীতাতেও কি তাই ? গীতা কি জনসমাজকে সংন্যাসীর মঠে পরিণত করিতে চান ? 'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ' ইত্যাদির গীতাভাষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ২।৬২-৩ শ্লোকের টীকায় তিনি বলিতেছেন—'তাহা নহে, ইন্দ্রিয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ নহে—তাহার বিশেষ বিধি পর শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

রাগদ্বেষ-বিযুক্তৈস্তু বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈ শ্চরন্।
আত্মবশ্যৈ র্বিধেয়াত্মা প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি ॥

'যিনি বিধেয়াত্মা*, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনার বশ্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ

* এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কান্তের Metaphysics of Ethics হইতে একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—All ethical gymnastic consists therefore simply in the subjugating the instincts and appetites of our physical system in order that we remain their masters in any and all circumstances, hazardous to morality. ইহাই 'বিধেয়াত্মা' হওয়া। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—'ইন্দ্রিয় সংযম ভিন্ন কোন প্রকার ধর্মাচরণ নাই। ইহা সকল ধর্মগ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্ম মন্দিরের প্রথম সোপান। সর্ব শাস্ত্রেই আগে ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা।'

করেন। অর্থাৎ, তাঁহার কৃত উপভোগ দুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ।' এই কথা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—'গীতোক্ত ধর্ম Ascetic Philosopby নহে—ইহা প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় ধর্ম। বিষয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে।'

প্রচলিত একটি প্রাচীন শ্লোকে এ কথার সমর্থন আছে—

ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা
য হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ

—ধর্ম অর্থ ও কাম যুগপৎ সেবা করিবে। যে ব্যক্তি এই ত্রিবর্গের একতমে আসক্ত, সে জঘন্য। সেই জন্য ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ !—৭।১১

বঙ্কিমচন্দ্র পুনশ্চ বলিতেছেন—

'Asceticism দূরে থাকুক, যাহাকে Puritanism বলে—এই গীতোক্ত ধর্ম তাহারও বিরোধী। কেন না Puritanism এই 'বিদ্বেষ'-বুদ্ধি-জাত,' (পাঠক! উদ্ধৃত গীতাশ্লোকের 'রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ' বিশেষণটি স্মরণ করুন)। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র একটা ঐতিহাসিক উদাহরণের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। 'রোমান্ ক্যাথালিক্ ধর্মোপদেষ্টাদিগের ইন্দ্রিয়-বিশেষের তৃপ্তির প্রতি বিদ্বেষ—কার্য্যতঃ না হউক, বিধিতঃ বটে। এই জন্য তাঁহাদের মধ্যে চির কৌমার বিহিত ছিল। ইহার ফলে কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন। কিন্তু আর্য ঋষিরা যথার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ—কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ নাই, বিদ্বেষও নাই। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মচর্য সমাপন করিয়া, যথাকালে দার পরিগ্রহ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যেমন বিদ্বেষশূন্য,

ইন্দ্রিয়ের প্রতি তেমনি অনুরাগশূন্য; অতএব কেবল ধর্মতঃ সন্তানোৎপাদন জন্যই বিবাহ করিতেন।'

গীতায় অবশ্য 'সংন্যাসে'র কথা ভূয়োভূয়ঃ আছে। কিন্তু—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্য-সংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি—গীতা, ৫।৩

'ইংরেজেরা যাহাকে Asceticism বলেন, সংন্যাস (বৈরাগ্য)-শব্দে তাহা বুঝায় না। এই পরম পবিত্র ধর্মে সেই পাপের মূলোচ্ছেদ হইতেছে। অথচ এমন পবিত্র, সর্বব্যাপী, উন্নতিশীল বৈরাগ্য আর কোথাও নাই। ইহাতে সর্বত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, সকর্ম বৈরাগ্য; অথচ Asceticism কোথাও নাই।'—ধর্মতত্ত্ব, ষোড়শ অধ্যায়।

গীতার সার কথা কি? গীতাভাষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এ কথার আলোচনা করিয়াছেন।

'সংযতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম হইয়া যে ঈশ্বরে চিত্তার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্বক নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান, ইহাই যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইহা হইলেই ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই হিন্দুধর্মের সারভাগ। গীতায় আর যাহা কিছু আছে, তাহা এই কথার সম্প্রসারণ মাত্র—অধিকার ভেদে পদ্ধতি-নিবাচন মাত্র। হিন্দুধর্মে বা অপর কোন ধর্মে ইহা ছাড়া যাহা কিছু আছে, তাহা ধর্মের প্রয়োজনীয় অংশ নহে। তাহা হয় উপন্যাস, নয় উপধর্ম, নয় সামাজিক নীতি, নয় বাজে কথা—ত্যাগ করিলেই ভাল।'

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র এই ঈশ্বরে চিত্তার্পণকে 'ঈশ্বরারাধনা' বলিয়াছেন। সর্বভূতে সমদৃষ্টিই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা।

সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতাম্ উপেত
সমত্বম্ আরাধনম্ অচ্যুতস্য—বিষ্ণুপুরাণ

আমরা ক্রমশঃ ভূয়োভূয়ঃ দেখিব, গীতোক্ত ঈশ্বরারাধনাও তাই—সর্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান, এবং সর্বভূতের হিতসাধন।* সেই জন্য গীতাকারের মুখে পুনঃ পুনঃ 'সর্বভূতহিতে রতঃ' পদটি প্রযুক্ত দেখিতে পাই।' গীতা বলেন,

মৎকর্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মাম্ এতি পাণ্ডব॥

—গীতা, ১১।৫৫

'সে-ই ভগবানের সহিত মিলিত হয়—যে তাঁহার কর্ম করে, তিনি যাহার পরম, যে তাঁহার ভক্ত, যে আসক্তিশূন্য, যে সর্বভূতে বৈরহীন।'

সাধারণতঃ মানুষ সংকীর্ণ ও অনুদার। সে জন্য দেখা যায়, মানবিক ধর্ম প্রায়ই সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট—My 'ism' is the only ism—'আমার ধর্মই ধর্ম—তোমার ধর্ম অ-ধর্ম, যদি না হয় উপধর্ম'। এই সংকীর্ণ মনোভাব, এই 'religious snobbishness' জগতে যে বিতণ্ডা বিবাদ বিগ্রহ অস্বস্তি ও অশান্তি উৎপন্ন করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। ইহার প্রতিকার কি? প্রতিকার গীতার উদাত্ত শিক্ষার অনুসরণ—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তান্ তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্বশঃ॥—গীতা, ৪।১১

'যে জন ভগবান্‌কে যে ভাবে চায়, সে তাঁহাকে সেই ভাবে পায়। মনুষ্য সর্ব প্রকারে তাঁহার পথেরই অনুবর্তন করে।'

---

* 'ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। ঈশ্বরে প্রীতিই জীবের সুখ বা ধর্ম। সর্বভূতকে ভাল বাসিবে।'—সীতারাম, তৃতীয় খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইহার ভাষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

'পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, কেহ নিরাকারের কেহ সাকারের উপাসনা করেন। কেহ একমাত্র জগদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন; কোনও জাতি ভূতযোনির, কোন জাতি বা পিতৃলোকের, কেহ সজীবের, কেহ নির্জীবের, কেহ মনুষ্যের, কেহ গবাদি পশুর, কেহ বা বৃক্ষের বা প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করে। এই সকলই উপাসনা, কিন্তু ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ আছে—অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সেই উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানের পরিমাণ মাত্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে পথিপার্শ্বে পুষ্পচন্দনসিন্দুরাক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচন্দন সিন্দুর লেপিয়া যায়; যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে না হয়, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির পরিমাণ-জ্ঞান সম্বন্ধে দুই জনেই প্রায় তুল্য অন্ধ। যে হিমালয় পর্বতকে বল্মীক-পরিমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র-পরিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ; ব্রহ্মবাদীও ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত নহেন—শিলাখণ্ডের উপাসকও নহে। তবে একজনের উপাসনা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য আর একজনের অগ্রাহ্য—ইহা কি প্রকারে বলা যাইবে? হয় কাহারও উপাসনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য নহে, নয় সকল উপাসনাই গ্রাহ্য। স্থূলকথা, উপাসনা আমাদের চিত্তবৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা সাধন জন্য—ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন জন্য নহে। যিনি অনন্ত আনন্দময়, যিনি তুষ্টি-অতুষ্টির অতীত, উপাসনার দ্বারা আমরা তাঁহার তুষ্টি বিধান করিতে পারি না। তবে ইহা যদি সত্য হয় যে তিনি বিচারক—কেন না কর্মের ফলদাতা—তবে যাহা তাঁহার বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাঁহার গ্রাহ্য হইতে পারে। যে উপাসনা কপট, কেবল লোকের

কাছে ধার্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় স্বরূপ, তাহা তাঁহার গ্রাহ্য নহে—কেন না, তিনি অন্তর্যামী। আর যে উপাসনা আন্তরিক, তাহা ভ্রান্ত হইলেও তাঁহার কাছে গ্রাহ্য। যিনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, বা তপশ্চারী, তাঁহার উপাসনা যদি কেবল লোকের কাছে পসার করিবার জন্য হয়,—তাহার অপেক্ষা যে অভাগী পুত্রের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীতলায় মাথা কুটে, তাহার উপাসনাই অধিক পরিমাণে ভগবানের গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয়।

'এইরূপ শ্লোকের তাৎপর্য বুঝিলে, পৃথিবীতে আর ধর্মগত পার্থক্য থাকে না; হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, জৈন, নিরাকার-বাদী, সাকার-বাদী, বহু দেবোপাসক, জড়োপাসক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের উপাসক—যে পথে তিনি আছেন, সেই পথে সকলেই যায়। এই শ্লোকোক্ত ধর্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম—একমাত্র সর্ব-জনাবলম্বীয় ধর্ম। ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্মের তুল্য উদার ধর্ম আর নাই—আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্যও আর নাই।'

সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র অসংকোচে বলিয়াছেন—

'ইহাই জগতে একমাত্র ধর্ম—ইহাই একমাত্র Catholic Religion.' (গীতাভাষ্য, ১৬৯ পৃষ্ঠা)। এইভাবে পাশ্চাত্যেরা কেহ কেহ গীতাকে 'Bible of Humanity' আখ্যা দিয়াছেন। এ সম্পর্কে ১৩১২ সনে 'গীতায় ঈশ্বরবাদে' আমি এইরূপ লিখিয়াছিলাম :—

"গীতা অতি অপূর্ব গ্রন্থ। জগতের সাহিত্যে এরূপ উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। * * গীতার একটি বিশেষত্ব—ইহার সার্বভৌমতা। গীতায় সাম্প্রদায়িকতা অথবা সঙ্কীর্ণতার লেশ মাত্র নাই। সেইজন্য সকল শ্রেণীর দার্শনিক, সকল সম্প্রদায়ের সাধক

গীতাকে সমান আদরের চক্ষে দেখেন। গীতা বিশ্বতোমুখ গ্রন্থ। কি কর্মী, কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি ভক্ত, সকলেরই পক্ষে গীতা তুল্য-উপাদেয়। * * গীতা সত্যের সূর্যস্বরূপ। সূর্যে যেমন সকল বর্ণের সমন্বয়, সেইরূপ গীতায় সমস্ত সার সত্যের সমন্বয়। গীতা যদি সার্বভৌম না হইয়া সত্যের একদেশ বা অংশ মাত্র প্রকটিত করিত, তবে কি গীতার শুভ্রালোকে বিশ্বজনের চিত্ত উদ্ভাসিত হইতে পারিত ?"

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"আমি 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বারা সর্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতাম।" তাঁহার ঐ প্রচেষ্টা যে অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, এ কথা অসংকোচে বলা যায়। এ সম্পর্কে তাঁহার নিজের কথা এই :—

'যেমন কুলিমজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।'

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে নিজের 'মজুরদারি'র উল্লেখ করিলেন—ইহা বিনয়ের পরাকাষ্ঠা বটে, কিন্তু এ আত্মগ্লানি অনাবশ্যক। প্রকৃত কথা এই, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী ছিল—সেই জন্য তিনি একাধারে কবি, শিল্পী, সমালোচক, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, দার্শনিক, সামাজিক ও ধর্মবেত্তা ছিলেন। অর্থাৎ, তাঁহা হইতে উৎসারিত যে বিবিধ ধারা বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও শ্রীবৃদ্ধ করিয়াছিল, আমাদের আলোচ্য প্রত্নতত্ত্বধারা ঐ বিভিন্ন ধারাসমূহের অন্যতম।

নানা ভাবে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করা যায়—প্রাচীন মুদ্রা, মূর্তি, পুথি পুস্তক, লিপি লেখ, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ভগ্নাবশেষ, ভূগর্ভ হইতে খনিত সৌধ শিলা শীল সজ্জা সরঞ্জাম ভূষণ বেশ অলঙ্কার প্রভৃতি উপকরণসমূহের যুগপৎ বা পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার দ্বারা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত: প্রাচীন গ্রন্থাদির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার প্রত্নতথ্য নির্মাণ করিতেন। তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধে' সংগৃহীত "দ্রৌপদী", "প্রাচীন

ভারতবর্ষের রাজনীতি", "আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প" প্রভৃতি প্রবন্ধ ঐরূপ অনুসন্ধানের ফল এবং তাঁহার "বাঙ্গালীর বাহুবল", "ভারতকলঙ্ক", "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার"—বিশেষতঃ তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাস", "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" (৭ম পরিচ্ছেদ) প্রভৃতি নিবন্ধ তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার জাজ্বল্য নিদর্শন।

প্রত্নতত্ত্ব গতিশীল শাস্ত্র—দিন দিন অনুসন্ধানের ফলে নবতর উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে এবং নূতন আলোক সম্পাতের ফলে প্রাচীন সিদ্ধান্ত সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইতেছে। বঙ্কিম-যুগে সারনাথ, সাঁচী, তক্ষশিলা, পাহাড়পুর প্রায় অবিজ্ঞাত ছিল—বেসনগরে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বাসুদেবের উদ্দেশে গ্রীক-উপাসক 'হিলিওডোরেণ সমর্পিত গরুড়ধ্বজং' ভূপ্রোথিত ছিল—সুতরাং "যীশুখ্রীষ্টের অনুকরণে বাসুদেব কৃষ্ণের অবতারত্ব"—এই পাশ্চাত্য উক্তির কোন চরম উত্তর ছিল না। বিশেষতঃ ঐ যুগে হারপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর খনন হইতে আবিষ্কৃত সুপ্রাচীন "সিন্ধুসভ্যতা" স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

প্রত্নতত্ত্বের উর্বর ক্ষেত্র প্রাচ্যবিদ্যা। যাঁহারা প্রাচ্যবিদ্যার আলোচক ও গবেষক, তাঁহাদিগকে 'Orientalist's বলে। বঙ্কিম-যুগে এ দেশে বেবার, লাসেন, কোলব্রুক, গোল্ডষ্টকর, উইলসন, ম্যাক্সমুলর প্রভৃতি প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণের একাধিপত্য ছিল। তাঁহারা যে প্রভূত শ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রত্নতত্ত্বালোচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন—ইহা অবিসংবাদিত; তবে ইহাও নিঃসংশয় যে, তাঁহারা প্রধানতঃ 'গরিমাগ্রন্থির' (superiority complex-এর) ফলে অনেক সময় অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। ঐ ওরিয়েণ্টালিষ্টদিগের প্রতি "দ্রৌপদী" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ রোষ-কটাক্ষ করিয়াছেন,—

'ইউরোপীয়েরা এ দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থসকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচনা পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্য জগতে আর কিছুই হইতে পারে না। আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই! এখনও অনেক বাঙ্গালী তাহা পাঠ করেন, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য এ কথাটা কতকু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি লিখিতে বাধ্য হইলাম'।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। সকলেই কোলব্রুকের নাম শুনিয়াছেন। অধ্যাপক গোল্ডষ্টকর ইঁহাকে Prince of Orientalists—'প্রাচ্য-বিদ্যাবিদের অধিরাজ' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ কোলব্রুকের মত নিপুণ গবেষক ও নৈষ্ঠিক পণ্ডিত পাশ্চাত্যের মধ্যে এ পর্যন্ত হয় নাই। তাঁহার একটা প্রকাণ্ড ভুল দেখুন। সাংখ্যাচার্যেরা বলেন,—যাঁহাদের উৎকট বৈরাগ্য হইয়াছে অথচ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই—দেহান্তে তাঁহাদের মোক্ষ হয় না, 'প্রকৃতিলয়' হয়—"বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ" (সাংখ্যকারিকা)। ঐ প্রকৃতিলয় কি, এখানে তাহার আলোচনা করিব না—আমার 'সাংখ্যপরিচয়' গ্রন্থে সে আলোচনা করিয়াছি।

সাংখ্যকারিকার প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্যের গুরুর গুরু গৌড়পাদ প্রকৃতিলয়ের অর্থ করিয়াছেন—

মৃতঃ অষ্টাসু প্রকৃতিষু প্রধানবুদ্ধ্যহংকারতন্মাত্রেষু লীয়তে।

সকলেই জানেন, সাংখ্যমতে 'অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ'—অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার ও পঞ্চ তন্মাত্র। যিনি প্রকৃতিলীন, তিনি ঐ অষ্ট তত্ত্বের কোন এক তত্ত্বে সুদীর্ঘ কাল বিলীন থাকেন, তদন্তে তাঁহার 'ভবপ্রত্যয়'

বা পুনর্জন্ম হয়। সাংখ্যমতের যাঁহারা পল্লবগ্রাহী, এ কথা তাঁহাদেরও অবিদিত নয়। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যাবিদের অধিরাজ কোলব্রুক কি বলিতেছেন, শুনুন,—

Gaurapada makes the meaning of the phrase sufficiently clear; according to him it signifies the resolution of even the subtle body into its constituent elements: but this is not in this case equivalent to liberation: it is only the term of one series of migrations, the soul being immediately reinvested with another *persona*, and commencing a new career of migratory existence until knowledge is attained.

প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অবদান—'কৃষ্ণচরিত্র'। কৃষ্ণ-চরিত্র একাধারে ধর্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব। ধর্মতত্ত্বের কথা এখানে কিছু বলিব না, কিন্তু কি প্রকারে ও প্রণালীতে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়—পাঠক যদি তাহা শিখিতে চান, তবে নিবিড় ভাবে এই 'কৃষ্ণচরিত্র' অধ্যয়ন করুন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' প্রথমতঃ মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন—তিনি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন, মহাভারত কল্পনামূলক কাব্য নয়, অনেকাংশে প্রমাণিক ইতিহাস (History)। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে কৃষ্ণের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মহাভারতই প্রাচীনতম—তাহার পর হরিবংশ ও পুরাণ (ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি)। হরিবংশ মহাভারতের খিলপর্ব—হরিবংশেই উল্লেখ আছে, উহা মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে রচিত। পুরাণ কি সত্যই প্রাচীন গ্রন্থ—না, পাশ্চাত্যদিগের সিদ্ধান্তিত খ্রীষ্টপর দশম হইতে চতুর্দশ শতকে সংকলিত অর্বাচীন গ্রন্থ? স্মরণ রাখিতে হয়, প্রাচীন ব্রাহ্মণে ও

উপনিষদে এমন কি, অথর্ববেদেও পুরাণের নাম পাওয়া যায়।

ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ—অথর্ববেদ, ১১।৭।২৪

পুরাণং বেদঃ সোঽয়ম্ ইতি কিঞ্চিৎ পুরাণম্ আচক্ষীত

—শতপথব্রাহ্মণ, ১৩।৪।৩।১৩

ইতিহাসঃ পুরাণং —বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৪।১০

ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্—ছান্দোগ্য, ৭।১।১

'পুরাণার্থবিশারদ' মহর্ষি বেদব্যাস তদানীং প্রচলিত ঐ 'পুরাণ' আখ্যান উপাখ্যান গাথা ও কল্প সংগ্রহ করিয়া পুরাণসংহিতা নামে এক সংগ্রহগ্রন্থ সংকলন করেন।

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।

পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।১৬

মহামুনি ব্যাস ঐ পুরাণসংহিতা স্বশিষ্য লোমহর্ষণকে প্রদান করেন—

পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ।

তৎশিষ্য কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংসপায়ন সেই মূল সংহিতার উপর তিনখানি উপসংহিতা প্রস্তুত করেন।

কাশ্যপঃ সংহিতাকর্তা সাবর্ণিঃ শাংসপায়নঃ।

লোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।১৯

এই চারিখানি সংহিতাই ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপরাণ, ভাগবত প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণের ভিত্তি। এ ভাবে বেদব্যাসকে অষ্টাদশ পুরাণের বক্তা বলা অসঙ্গত নয়।

অষ্টাদশপুরাণানাং বক্তা সত্যবতীসুতঃ।

অর্থাৎ, আদিতে পুরাণ এক ছিল, পরে অষ্টাদশ হইয়াছিল—

পুরাণম্ একমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ!—মৎস্যপুরাণ, ৫৩।৪

প্রশ্ন উঠিবে, খ্রীষ্টপূর্ব যুগে ঐ অষ্টাদশ পুরাণের অন্ততঃ কয়েকখানি বিদ্যমান ছিল কি না? নিশ্চয়ই ছিল—কারণ, আমরা দেখিতে পাই, আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রে পুরাণ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

অথ পুরাণে শ্লোকৌ উদাহরতি—

অষ্টাশতসহস্রাণি যে প্রজামীষিরর্ষয়ঃ ইত্যাদি।—আপস্তম্ব, ২।২

ঐ দুই শ্লোক কিছু পরিবর্তিত আকারে অধুনা-প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণে, মৎস্যপুরাণে ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাওয়া যায়।

আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রের আর এক স্থলে নাম করিয়া ভবিষ্যপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

আভূতসংপ্লবাৎ তে সর্গজিতঃ পুনঃ সর্গে বীজার্থা ভবন্তি ইতি ভবিষ্যপুরাণে—আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র, ২।২৪।৫-৬

আপস্তম্ব কত দিনের লোক? প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ব্যুলার সাহেব বলেন, আপস্তম্ব খুব সম্ভব, পাণিনির পূর্ববর্তী (পাণিনি খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে জন্মিয়াছিলেন)—অধস্তন পক্ষে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের লোক।

পাণিনির কালনির্ণয় সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আছে, কিন্তু তিনি যে বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী, তাহা একরূপ নিঃসংশয়। কারণ, যে সময় পাণিনি সূত্র-রচনা করেন, তখনও 'নির্বাণ' শব্দ মোক্ষ-অর্থে প্রচলিত হয় নাই এবং 'আরণ্যক' শব্দ দ্বারা আরণ্যক গ্রন্থ বুঝাইত না। পাণিনির সূত্র দুইটি এই :—

'অরণ্যং মনুষ্যে'—অরণ্য শব্দের উত্তর 'ঞিক' প্রত্যয় দ্বারা অরণ্য-বাসী মনুষ্যবাচক 'আরণ্যক' শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

'নির্বাণোঽবাতে'—নির্বাণ শব্দের অর্থ নির্বাত (বায়ুশূন্য স্থান)।

আর এক কথা। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, কয়েকখানি পুরাণ

নিজ নিজ সংকলনকাল স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণকার বলিতেছেন—অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ সম্প্রতি ভারতবর্ষের সম্রাট্।

অভিমন্যোঃ উত্তরায়াং···পরীক্ষিৎ জজ্ঞে যোঽয়ং সাম্প্রতম্ এতৎ ভূমণ্ডলম্ অখণ্ডিতায়তি ধর্মেণ পালয়তীতি—বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২০।১২-৩

গরুড়পুরাণ বলেন, জনমেজয়ই বর্তমান রাজা এবং তাঁহার উত্তর ভবিষ্য রাজবংশ কীর্তন করেন।

সুহোত্রাণি রমিত্রশ্চ পরীক্ষিৎ অভিমন্যুজঃ।

জনমেজয়স্ত চ সুতো ভবিষ্যাংশ্চ নৃপান্ শৃণু॥—গরুড়পুরাণ, ১৪৪।৪২

মৎস্যপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন যে, অধিসীমকৃষ্ণ (ইনি জনমেজয়ের প্রপৌত্র) 'সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ'।

অথাশ্বমেধেন ততঃ শতানীকস্ত বীর্যবান্।

যজ্ঞেঽধিসীমকৃষ্ণাখ্যঃ সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ।

তস্মিন্ শাসতি রাষ্ট্রং তু যুষ্মাভিরিদমাহৃতম্॥—মৎস্যপুরাণ, ৫০।৬৬-৭।

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, খ্রীষ্টজন্মের অনেক পূর্ব হইতে অষ্টাদশ পুরাণের অন্ততঃ কয়েকখানি বিদ্যমান ছিল। অতএব পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ উড়াইয়া দিবার যোগ্য নয়।

তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের বিবরণে প্রধানতঃ মহাভারতেরই ব্যবহার করিয়াছেন। এই মহাভারত 'শতসাহস্রী' অর্থাৎ লক্ষ শ্লোকাত্মক—উহা উগ্রশ্রবা-সৌতি-বিরচিত। সৌতি বলেন, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব (ইনি শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক) চব্বিশ হাজার শ্লোকাত্মক ভারতসংহিতা নামে এক আদিগ্রন্থ রচনা করেন—

চাতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।

ভারতসংহিতার বক্তা সঞ্জয় এবং শ্রোতা ধৃতরাষ্ট্র। উহার আরম্ভ ছিল পাণ্ডুর দিগ্‌বিজয়ে—'পাণ্ডুর্জিত্বা বহূন্ দেশান্ যুধা চ বিক্রমেণ চ'

(শ্রীকৃষ্ণ) ভয়শীল—তুমিই ইহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে পঁহুছিয়া দাও।'
নন্দের এই নিদেশে পথিস্থ কুঞ্জদ্রুমাভিমুখে চলিত রাধা-মাধবের
যমুনাকূলে অনুষ্ঠিত বিজনকেলিসমূহ জয়যুক্ত হউক।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, যে সময় গীতগোবিন্দ রচিত হয়, সে সময় ঐ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রচলিত ও অতিশয় সম্মানিত না থাকিলে, গীতগোবিন্দ লিখিত হইত না এবং বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন সুবিজ্ঞাত না থাকিলে, গীতগোবিন্দের 'মেঘৈর্মেদুরম্' ইত্যাদি প্রথম শ্লোক কখনও রচিত হইত না। এ কথার তাৎপর্য কি ?

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, গীতগোবিন্দের ঐ প্রথম শ্লোকের ভাবার্থ বেশ অস্পষ্ট—টীকাকার কি অনুবাদকার, কেহই উহা বিশদ করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের উক্ত পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে জয়দেবের ঐ 'মেঘৈর্মেদুরম্' শ্লোকের ভাবার্থ বেশ বিস্পষ্ট হয়। কিরূপে ?

ব্রহ্মবৈবর্ত বলেন, একদা নন্দ, শিশু কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবনের ভাণ্ডীরবনে গোচারণ করিতেছিলেন—

একদা কৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ।
তত্রোপবনভাণ্ডীরে চারয়ামাস গো-কুলম্।

—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৫।১

ইতিমধ্যে মায়া-শিশু শ্রীকৃষ্ণ মায়া দ্বারা আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করিলেন—

চকার মায়য়াকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে!

সেই মেঘাবৃত গগন ও শ্যামল কানন দেখিয়া বজ্রাঘাত ও ঝঞ্ঝা-বাতের শব্দে নন্দ ভীত হইলেন—নন্দো ভয়মবাপ হ।

মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট্বা শ্যামলং কাননান্তরং।

ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দং চ দারুণম্ ॥—১৫।৪

নন্দ বলিতে লাগিলেন—'কি করি, কোথা যাই—ভবিতা বালকস্য কিম্? শিশুর কি উপায় হয়?' এদিকে শ্রীকৃষ্ণ যেন ভয়ে ভীত হইয়াই পিতার কণ্ঠ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

মায়াভিয়া ভয়েভাশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ।

এমন সময় শ্রীরাধা (তিনি তখন পূর্ণ কিশোরী) শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপনীত।

• এতস্মিন্ অন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণ-সন্নিধিম্।

নন্দ, রাধিকার রূপলাবণ্যে বিস্মিত হইয়া সাশ্রুনেত্রে ভক্তিভরে বলিলেন—'আমি ঋষিমুখে শুনিয়াছি, তুমি পরাপ্রকৃতি—কমলার অপেক্ষাও হরি-প্রিয়া।'

জানামি ত্বাং গর্গমুখাৎ পদ্মাধিকপ্রিয়াং হরেঃ।

পরাং নির্গুণামচ্যুতাম্ * * ॥

—'হে ভদ্রে! এই তোমার প্রাণনাথকে গ্রহণ কর—যথাসুখে বিচরণ কর—পরে মনোরথ পূর্ণান্তে আমার পুত্র আমাকে দিও'—

গৃহাণ প্রাণনাথঞ্চ গচ্ছ ভদ্রে! যথাসুখং।

পশ্চাৎ দাস্যসি মৎপুত্রং কৃত্বা পূর্ণং মনোরথম্ ॥—১৫।১৫

রাধা মধুর হাস্য করিয়া বালককে গ্রহণ করিলেন—

জগ্রাহ বালকং রাধা জহাস মধুরং সুখাৎ

এবং কৃষ্ণকে সানন্দে বক্ষে ধারণ করিয়া যথেপ্সিত দূরদেশে গমন করিলেন—

এবমুক্ত্বা তু সানন্দং কৃত্বা কৃষ্ণং স্ববক্ষসি।

গত্বাদূরে তং নিনায় বাহুভ্যাং চ যথেপ্সিতম্ ॥—১৫।২৫

স্মৃতিমাত্রে সেই বিচিত্র কাননে অপূর্ব রাসমণ্ডলের আবির্ভাব হইল—রাধা বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন—সেখানে পীতাম্বর বনমালী মদনমোহন কিশোর শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত রহিয়াছেন—

পুরুষং কমনীয়ঞ্চ কিশোরং শ্যামসুন্দরং।
কোটিকন্দর্পলীলাভং চন্দনেন বিভূষিতম্॥

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! সেই ক্রোড়স্থ শিশু অন্তর্ধান করিয়াছেন—তাঁহার স্থলে নবযুবা শ্যামসুন্দর!

ক্রোড়ং বালকশূন্যঞ্চ দৃষ্ট্বা তং নবযৌবনং।
সর্বস্মৃতিস্বরূপা সা তথাপি বিস্ময়ং যযৌ॥—১৫।৩৫

রাধিকা অনিমেষ নয়নে সেই রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন—তাঁহার চিত্ত লালসায় পূর্ণ হইল—তিনি 'মদনাতুরা' হইলেন—

নিমেষরহিতা রাধা নবসঙ্গমলালসা।
পুলকাঙ্কিতসর্বাঙ্গী সস্মিতা মদনাতুরা॥

ইহার পর 'রহঃকেলয়ঃ' যেমন হওয়া উচিত, সম্পন্ন হইল—কোনরূপ অঙ্গহানি হইল না—

পুনস্তাঞ্চ সমাকৃষ্য সস্মিতাং বক্রলোচনাং।
ক্ষতবিক্ষতসর্বাঙ্গাং নখদন্তৈশ্চকার হ॥

রতিরণের পর রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের বেশবিন্যাস করিতে গেলেন—কি আশ্চর্য! অমনি শ্রীকৃষ্ণ কিশোর রূপ পরিহার করিয়া পূর্ববৎ শিশুরূপ পরিগ্রহ করিলেন! রাধা কি করেন? ত্বরায় বৃন্দাবন হইতে বহির্গত হইয়া মেঘজলের মধ্যে আর্দ্র বসনে রোরুদ্যমান শ্রীকৃষ্ণকে

ক্রোড়ে লইয়া নন্দ-গৃহে উপনীত হইলেন এবং যশোদাকে পুত্র প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন—

গৃহাণ বালকং ভদ্রে স্তনং দত্ত্বা প্রবোধয়।

যশোদা তাহাই করিলেন—

যশোদা বালকং নীত্বা চুচুম্ব চ স্তনং দদৌ।

ইহাই ব্রহ্মবৈবর্তের বিবরণ—জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরম্' শ্লোক যে, এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে কি?

বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন—বর্তমান আকারেও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ জয়দেবের পূর্ববর্তী অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের পূর্বগামী।

বঙ্কিমচন্দ্র ইহাও দেখাইয়াছেন যে, পঞ্চম শতকে রচিত কালিদাসের 'মেঘদূতে'ও বর্হাপীড়াভিরাম গোপবেশ বিষ্ণুর উল্লেখ আছে—

বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিণা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ।

কিন্তু শ্রীরাধা যে তাঁহার বামে, তাহার নিশ্চয়তা কি?

অনেক দিন অবধি ইহাই পর্যন্ত ছিল। ঘটনাক্রমে কয়েক বৎসর হইল 'হালসপ্তশতী' নামক প্রাকৃত শ্লোকসংগ্রহগ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়। ঐ গ্রন্থে রাধিকার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। প্রাকৃত শ্লোকটি এই:—

মুখমারুতেণ তং কহ্ন! গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতাণং বল্লবীণং অন্নাণং বি গোরবং হরসি॥—১।৮৯

ইহার সংস্কৃত রূপ এই:—

মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ! গোরজো রাধিকায়া অপনয়ন্।
এতাসাং বল্লবীনাম্ অন্যাসামপি গৌরবং হরসি॥

—'রাধিকার মুখসক্ত গোধূলি মুখমারুতে অপনোদন করিয়া হে কৃষ্ণ! তুমি অন্য গোপিকাদিগের গৌরব হরণ করিতেছ।'

হাল কত দিনের লোক? এ বিষয় লইয়া মতভেদ আছে। অধ্যাপক সেনা (Senart) বলেন, হাল খ্রীষ্টপর তৃতীয় শতকের লোক। অপরে বলেন, তিনি প্রথম শতাব্দীর লোক। যাহাই হউক, হালের সংগৃহীত এই প্রাকৃত শ্লোক নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ববর্তী। অতএব কৃষ্ণলীলায় রাধার যোগ কোন মতেই অর্বাচীন নহে। এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত কালসহকারে দুর্বল না হইয়া দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ব ক্ষেত্রে ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি কত বড় প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন—কিরূপ নিপুণ গবেষক ও সূক্ষ্ম বিচারক ছিলেন—এই রাধাতত্ত্বের আলোচনাই তাহার চরম নিদর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের 'ঐকান্তী' ভক্ত ছিলেন—ভক্তেষৈকান্তিনো মুখ্যাঃ। তিনি 'ধর্মতত্ত্বে'র চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিতেছেন :—

যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব নিষ্কাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্যস্থাপনের কর্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তারপর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্বপ্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন,—"বেদে ধর্ম নহে—ধর্ম লোকহিতে"—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ববলাধার, সর্বগুণাধার, সর্বধর্মবেত্তা, সর্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

এই মহনীয় কৃষ্ণস্তুতিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হউন বা না হউন" কিন্তু তিনি নিজে বিশ্বাস করিতেন—শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় বারের "বিজ্ঞাপনে" তিনি লিখিতেছেন, "আমি

নিজে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি ;—সে বিশ্বাস আমি লুকাই নাই।" পুনশ্চ—"আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি ; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে"* ('কৃষ্ণচরিত্র'—উপক্রমণিকা)। এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্র অকুণ্ঠভাবে বলিয়াছেন, "প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।" ('কৃষ্ণচরিত্র'—প্রথম খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)।

'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র বেশ নিপুণভাবে বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি—কবি-ভক্ত-ভাবুকের কল্পনাপ্রসূত রূপক মাত্র নহেন। (গত অধ্যায়ে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি)। তিনি গৌরদাস বাবাজির মুখে ('প্রচার', ১২৯২, আষাঢ়) বলিতেছেন :—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগদীশ্বর সশরীরে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ধর্মস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রূপক নহেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' খাণ্ডবদাহের পর যুধিষ্ঠিরের সভানির্মাণ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ স্বজীবনে দুইটি কার্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্য সংস্থাপন। ধর্মপ্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই। এই সভা-নির্মাণ ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের প্রথম সূত্র। এইখানেই তাঁহার

* অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—"মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণু ঈশ্বরের অবতার—এ কথা বলা হইয়াছে সত্য বটে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণে অবতারত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।"—গীতাভাষ্য, পৃ. ২২৩।

এই অভিসন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের সভা নির্মাণ হইতে যে সকল ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহা ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে পরিণত হইল।* ধর্মরাজ্য সংস্থাপন জগতের কাজ; কিন্তু যখন তাহা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভা সংস্থাপন তাঁহার নিজের কাজ।"

বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম। মনুষ্যত্বের উপাদান আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি বা বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা। ঐ বৃত্তিগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী। মনুষ্যত্বের জন্য ঐ বৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত করিতে হইবে, কিন্তু তৎসঙ্গে তাহারা সমঞ্জস হওয়া চাই। তিনি 'কৃষ্ণচরিত্রে' বলিতেছেন :—

'সকল বৃত্তির সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা-সাধন অতি দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী; আমরা শরীরী। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত; আমরা সান্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন।'—১ম খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ।

---

* যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করা কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব প্রতিপদে তিনি তাহার উদ্যোগ করিতেছেন :—'কৃষ্ণচরিত্র', চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

'এই সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন জন্যই ঈশ্বরের শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতার-গ্রহণ। আমি কৃষ্ণচরিত্র-বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াছি, যে, মনুষ্যত্বের আদর্শ-প্রচারের জন্য ভগবানের মানবদেহ ধারণ। অন্য উদ্দেশ্য সম্ভবে না। আদর্শ মনুষ্য আদর্শকর্মী।'—গীতাভাষ্য, পৃ, ২২৭।

'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

'কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে মানবরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্ত শক্তিমান্, তাঁহার কাছে কংস-শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাহারা হিন্দু ধর্মের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা দুরাত্মা-বিশেষের নিধন। আসল কথা, 'ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' এই ধর্মসংরক্ষণ কেবল সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন দ্বারাই হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ, ইহা ভাবিলে তাঁহার সকল কার্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্র-স্বরূপ রত্ন-ভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শ পুরুষতত্ত্ব।'
—'কৃষ্ণচরিত্র', ৪র্থ খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণই আদর্শ মানব। কারণ, সমস্ত মানবিক বৃত্তি তাঁহাতে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত অথচ সমঞ্জস।* 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশের

---

* কৃষ্ণ যখন আদর্শ মনুষ্য, তখন তাঁহার কোন বৃত্তিই অননুশীলিত বা স্ফূর্তিহীন থাকিবার সম্ভাবনা নাই (কি শারীরিকী, কি জ্ঞানার্জনী, কি কার্যকারিণী, কি চিত্তরঞ্জিনী)।...এই রাসলীলা কৃষ্ণ ও গোপীগণকৃত সেই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ। কৃষ্ণপক্ষে ইহা উপভোগ মাত্র, কিন্তু গোপীপক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা। ('কৃষ্ণচরিত্র', ২য় খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'নবজীবনে' অনুশীলন ধর্মের আলোচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচরিত্রে'র প্রথম বারের "বিজ্ঞাপনে" তিনি লিখিতেছেন :—

'অনুশীলন ধর্মে যাহা তত্ত্বমাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া তার পর উদাহরণ দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।'

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

'মনুষ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অর্থাৎ সর্বাঙ্গসম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এ জন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়?'

এই জন্য ধর্মেতিহাসের প্রয়োজন। ধর্মেতিহাসের (Religious History-তে) প্রকৃত ধার্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্ত-প্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য; কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যিশুখৃষ্ট খৃষ্টিয়ানের আদর্শ এক কালে ছিলেন, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ ছিলেন। কিন্তু এরূপ ধর্মপরিবর্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকেই নাই, কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও

সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন কৌপীনধারী নির্মম ধর্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্বগুণবিশিষ্ট—ইঁহাদিগেতেই সর্ববৃত্তি সর্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্মুকহস্তেও ধর্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছেন, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্মশিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষণ যাঁহার অংশ মাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখনও মনুষ্য-ভাষায় কীর্তিত হয় নাই। আইস, আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি।...

তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) শারীরিক বৃত্তিসকল সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল সেইরূপ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া সর্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য এবং জ্ঞানে পরিণত এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্বলোকের সর্বহিতে রত।'

কংসবধের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

'এই কংসবধেই দেখি—কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম ধর্মাত্মা, পরহিতে রত এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি আদর্শ মনুষ্য।'—'কৃষ্ণচরিত্র', তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ।

'...যিশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্ম-প্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ধার্মিকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত, সন্দেহ নাই। আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যিশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শ পুরুষ নহেন।'

পুনশ্চ—'যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ও ধর্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই আদর্শ মনুষ্য।'—কৃষ্ণচরিত্র, ৪র্থ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ যে আদর্শ মানব, বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' এ কথা ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

'কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী এবং ধর্মপ্রচারক। সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্মবেত্তাদিগের এবং একাধারে সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের আদর্শ।...যিনি এইরূপে পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্যে ও শিক্ষায়, কর্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্মে, দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্যরূপেই সর্বশ্রেষ্ঠ—তিনিই আদর্শ পুরুষ।'

'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

"বাল্যে কৃষ্ণ শারীরিক বলে আদর্শ-বলবান্। তাঁহার অশিক্ষিত বলপ্রভাবে বৃন্দাবন সুরক্ষিত...কংসের মল্ল প্রভৃতি নিহত হইয়াছিল। এই বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষত্রিয়সমাজে সর্বপ্রধান অস্ত্রবিৎ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কেহ কখনও তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই...সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈনাপত্যে সে সময়ের যোদ্ধাগণ পটু ছিলেন না...কৃষ্ণের সৈনাপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—জরাসন্ধ-যুদ্ধে এবং রৈবতক পর্বতমালায় দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী-নির্মাণে। সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে কোন ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না...

শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তিসকল যে চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত, কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম (বিশেষতঃ ভগবদ্গীতায়) ইহার তীব্রোজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ...রাজধর্মে বা রাজনীতি সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে,

কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত।...তাঁহার বুদ্ধি সর্ব-ব্যাপিনী, সর্বদর্শিনী, সকল প্রকার উপায়ের উদ্ভাবিনী। মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া যতদূর সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ ততদূর সর্বজ্ঞ...

কৃষ্ণের কার্যকারিণী বৃত্তিসকলও চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত। তাঁহার সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা এবং সর্ব কর্মে তৎপরতার অনেক পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার ধর্ম ও সত্য যে অবিচলিত, এ গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপূর্ণ। সর্বজনে দয়া ও প্রীতিও এই ইতিহাসে পরিস্ফুট হইয়াছে।...

এই সকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণে চরম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না—কেন না, তিনি আদর্শ মনুষ্য...

উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্বত্র সর্বসময়ে সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্মে অপরাঙ্মুখ,—ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোক-হিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্মম, নিরহংকার, যোগযুক্ত, তপস্বী।...

যিনি মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন—তিনি অন্ততঃ বলিবেন, কৃষ্ণ was "the wisest and greatest of the Hindus"—আর যিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুক্তকরে বিনীত ভাবে আমার সঙ্গে বলুন—

"নাকারণাৎ কারণাদ্ বা কারণাকারণাৎ ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্মত্রাণায় তে পরম্॥"

এ সকল কথার সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। আমার বিশ্বাস, যিনিই নিবিষ্ট ভাবে 'কৃষ্ণচরিত্র' অধ্যয়ন করিবেন, তিনিই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সুর মিলাইয়া বলিবেন—কৃষ্ণচরিত্র আদর্শ চরিত্র বটে, শ্রীকৃষ্ণ

আদর্শ মানব—সর্বগুণাধার, সর্বজ্ঞানাধার, সর্ববলাধার, সর্বরসাশ্রয়—তাঁহাতে সমস্ত বৃত্তি ও শক্তি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত অথচ সু-সমঞ্জস। কিন্তু তাহাতে কি সিদ্ধ হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার? সত্য বটে, বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই।" এবং "মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার জন্য তিনি অবতীর্ণ হন"—অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে যখন সম্পূর্ণ আদর্শ মূর্তিবিশিষ্ট, তখন শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে, যাঁহারা ঈশ্বরের সারূপ্য-প্রাপ্ত—গীতায় ভগবান্ যাঁহাদিগকে 'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ' বলিয়াছেন, তাঁহারাও প্রয়োজনবশে উর্ধ্বলোক হইতে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হইতে পারেন। বলা বাহুল্য, যাঁহারা 'মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ' তাঁহারা ঈশ্বর না হইলেও আদর্শ পুরুষ—কারণ, তাঁহারা 'পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদং'—তাঁহারা যিশুখৃষ্টের ভাষায় "are perfect as our Father in Heaven is perfect"—পরব্যোমে পরমপিতা যেমন পূর্ণ, তেমনি সম্পূর্ণ।

পরব্যোমে পরমপিতা—সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সম্পূর্ণ—পূর্ণম্ অদঃ! এ কথার অর্থ কি? অর্থ এই যে, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম একাধারে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির উজ্জ্বল প্রস্রবণ—যুগপৎ অখণ্ড প্রতাপ, অতর্ক্য প্রজ্ঞা ও অজস্র প্রেমের অফুরন্ত উৎস—"is the glorious Trinity of Power, Wisdom and Bliss"

জীব যখন ব্রহ্মখণ্ড—মমৈবাংশঃ, "made in the image of God," ব্রহ্ম-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ, ব্রহ্মসিন্ধুর বিন্দু—তখন জীবে নিশ্চয়ই "অস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্"। কিন্তু ব্রহ্মে যাহা প্রকট, জীবে তাহা প্রচ্ছন্ন,—ব্রহ্মে যাহা বিকশিত, জীবে তাহা বীজাবস্থ। এ ভাবে ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক—অধিকন্তু ভেদ-নির্দেশাৎ (ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২২)। কিন্তু জীবের

নিয়তি এই যে, কালক্রমে ঐ বীজ বৃক্ষে পরিণত হইবে—ঐ সকল অব্যক্ত শক্তি ও সম্ভাবনা সুব্যক্ত হইবে—ঐ সুপ্ত সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও আনন্দ-ভাব প্রবুদ্ধ হইয়া জীব শিব হইবে। ইহারই নাম ব্রহ্মসারূপ্য—খৃষ্টানী ভাষায় Deification ("The wonder of wonders is the human made Divine.") । ইহাই গীতার "মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ" । তখন স্ফুলিঙ্গ সমিদ্ধ হইয়া অগ্নি হয়, বিন্দু সম্প্রসারিত হইয়া সিন্ধু হয়। যাঁহাদের আমরা অবতার বলি—তাঁহারা কেহ কেহ ঈশ্বরের অবতার বটেন, কিন্তু অপরে এইরূপ আদর্শ পুরুষ—Deified Men—ব্রহ্মের সারূপ্যপ্রাপ্ত মুক্তাত্মা।

শ্রীকৃষ্ণ কি ঈশ্বরের অবতার অথবা ঐরূপ সারূপ্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের অবতার? আমরা দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে তিনি ঈশ্বরের অবতার। কিন্তু ঈশ্বরাবতার হইলেও শ্রীকৃষ্ণ (বঙ্কিমচন্দ্রের মতে) "মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্য সম্পন্ন করিতেন।"* 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র ইহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ অতিপ্রাকৃত কার্য দ্বারা বা নৈসর্গিক নিয়মের বিলঙ্ঘন দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন করেন নাই। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বিষ্ণুপুরাণ হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

মনুষ্যধর্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ।
··· মনসৈব জগৎসৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ ॥

---

* "প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত" প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র ঐ কথাই বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতাররূপে কল্পিত হইলেও মানুষের ন্যায় মানবধর্মাবলম্বী। মানব-চরিত্রগত এমন একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই যে, তাহা ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অঙ্কিত হয় নাই।"

তস্যারিপক্ষক্ষপণে ক্বোহয়ম্ উদ্যমবিস্তরঃ।
মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টাম্ ইত্যেবম্ অনুবর্ত্ততঃ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ৫।২২।১৪-৭

"জগদীশ্বর হইলেও শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যধর্মশীল বলিয়া তাঁহার এইরূপ লীলা। যিনি সংকল্পমাত্রে জগতের সৃষ্টি সংহার সম্পন্ন করেন, অরি-ক্ষয় তাঁহার তুচ্ছ কার্য। তথাপি লীলাবশে মনুষ্যদেহধারীর অনুরূপ তাঁহার ক্রিয়া।"

—এবং সমাদরের সহিত অধ্যাপক ল্যাসেনের ও উইল্‌সনের মত উপন্যস্ত করিয়াছেন :—

It is true that in the epic poems, both Rama and Krisna appear as incarnations of Visnu but they at the same time come before us as human heroes...acting according to human motives and taking no advantage of their divine superiority.—Lassen.

He [Krisna] exercises no superhuman faculties in defence of himself or his friends or in the defeat and destruction of his foes.—Wilson.

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন :—

'ভরসা করি, ইহার পর কোন পাঠক বিশ্বাস করিবেন না যে, কৃষ্ণ মনুষ্যদেহে অতিমানুষ শক্তিদ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।'

আমি বঙ্কিমচন্দ্রের এক জন নিবিষ্ট পাঠক। কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য যে, আমার বিশ্বাস, মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োজন হইলে অতিমানুষ শক্তির প্রয়োগ করিতেন এবং তথাকথিত

প্রাকৃতিক নিয়ম বিলঙ্ঘন করিতেন। গীতায় উল্লিখিত বিশ্বরূপ-প্রদর্শন ইহার জাজ্বল্য উদাহরণ। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনের কশ্মল অপনোদন জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজ শরীরে বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইহাকে আমি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

'যোগেশ্বর' কৃষ্ণের ইহা অতিমানুষ কার্য নহে কি? কথাটা একটু বুঝাইয়া বলি। ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে যে বিরাট্ ব্যবধান, ঐ ব্যবধান বিবিধ দৈবশক্তির দ্বারা অধিষ্ঠিত।* ঐ দৈবশক্তি পরস্পর বিবদমান। ঐ বিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়কে আমরা এ দেশে দেবাসুর বলি—খৃষ্টানের Good and Evil Angels। সয়তান বা Ahriman কবিকল্পনা নহে—বস্তুতঃ ঈশ্বরের অভিপ্রেত বিবর্তনের ঋতমার্গের পরিপন্থী নির্ঋতি বা Dark Powers আছে। পুরাণ-ইতিহাসে দেখিতে পাই, যখন ঐ বামমার্গী অসুরশক্তি অবতীর্ণ হইয়া বিবর্তনের গতিরোধ করিয়া ধরাকে ভারাক্রান্ত করে, তখন ধরিত্রীর আকুল আহ্বানে ভগবান্ অবতার গ্রহণ করেন—

ভূমেঃ সুরেতরবরূথ-বিমর্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ ॥

—ভাগবত, ২।৭।২৬

ইহাই গীতার "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"। কৃষ্ণ অবতারের পূর্বেও

---

* এই সম্পর্কে আমার *Philosophy of the Gods* গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা আছে।

ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। কয়েক জন প্রবলপরাক্রান্ত অসুর কংস, জরাসন্ধ, শিশুপালরূপে অবতীর্ণ হইয়া উন্নতির পথ অর্গলবদ্ধ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করিতে তাহারা যে মনুষ্যশক্তির অতিরিক্ত কিছু করে নাই—ইহা সম্ভব নহে। তাহাদের কৃত বাধা অপনোদন করিয়া ধরার ভার লাঘব করিতে যদি শ্রীকৃষ্ণ সময়ে সময়ে দৈবশক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে অবিশ্বাসের কি আছে? বিশেষতঃ যখন বঙ্কিমচন্দ্র অতিপ্রকৃতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহার রচনার নানা স্থানে তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত পাঠককে শুনাইলাম। এইবার আমার বক্তব্য বলিয়া অধ্যায়ের উপসংহার করি।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ধর্মজগতের প্রধান প্রহেলিকা—greatest mystery, অত্যদ্ভুত রহস্য। বঙ্কিমচন্দ্র যে এই জটিল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। কথাটার একটু বিস্তার করি।

হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ঋষিরা বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই Triple Logos-এর প্রকাশগত প্রভেদের উপদেশ করিয়াছেন। বিষ্ণু কে? বিষ্ণু "ক্ষৌণীভর্তা"—অর্থাৎ আমাদের ভূমণ্ডলের অধিদেবতা (Planetary Logos),—বৈষ্ণব পরিভাষায় ক্ষীরোদশায়ী বা শ্বেতদ্বীপপতি। আমাদের পৃথিবীর যেমন ভর্তা (Planetary Logos) আছেন, সৌরমণ্ডলভুক্ত মঙ্গল বুধ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহেরও সেইরূপ অধিপতি আছেন। তাঁহারা সেই সেই গ্রহের অধিদেবতা (Planetary Logos)।

তাঁহাদের সকলের উপরে সৌরমণ্ডলের অধিপতি মহাবিষ্ণু ব

সূর্যনারায়ণ—যোঽসৌ আদিত্যে পুরুষঃ (উপনিষদ্)—Solar Logos —যিনি

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।

বৈষ্ণব পরিভাষায় ইনি গর্ভোদশায়ী বা চতুর্ভুজ নারায়ণ।

কিন্তু সৌরমণ্ডল (Solar system) ত' একটি নয়—অগণ্য। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আকাশে বিলম্বিত রহিয়াছে—কারণ, প্রত্যেক তারা এক একটী সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র—"Each star is a sun and as such the centre of a solar system." ৬

কোটিকোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি বৈ।

বরং সমুদ্রসৈকতের বালুকণা গণিয়া শেষ করা যায়—কিন্তু অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের গণনার শেষ হয় না—

সংখ্যা চেৎ রজসাম্ অস্তি বিশ্বেষাং ন কদাচন।

ঋষিরা বলেন, প্রত্যেক সৌরমণ্ডলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঈশ্বর বা Solar Logos আছেন—ইঁহারা প্রত্যেকে ত্রিমূর্তি বা Trinity—তিনেই এক, একেই তিন।

প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।

কিন্তু এই সমস্ত ঈশ্বরের উপর এক জন মহেশ্বর পরমেশ্বর আছেন—তিনিই Central বা Supreme Logos—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর—জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ—তিনি অগণ্য ঈশ্বরের একমাত্র ঈশ্বর—এক এব মহেশ্বরঃ।

তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর

ইনিই বেদান্তের পরব্রহ্ম—একমেবাদ্বিতীয়ম্—বৈষ্ণব পরিভাষায় কারণার্ণবশায়ী বা গোলোকপতি।

এখন প্রশ্ন এই—শ্রীকৃষ্ণ যদি অবতার, তবে কাহার অবতার—বিষ্ণুর, মহাবিষ্ণুর, না মহেশ্বরের? এ সম্পর্কে শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিভ্রান্ত হইতে হয়।

আমরা দেখি, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিতে বলিয়াছেন :—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদ্ অস্তি ধনঞ্জয়!
ময়ি সর্বম্ ইদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥—৭।৭

"আমা হতে পরতর নাহি কিছু ধনঞ্জয়!
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সূত্রে যথা মণিচয়।"

সভাপর্বে ভীষ্মদেবের মুখে শুনি—

কৃষ্ণ এব হি লোকানাম্ উৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বম্ ইদং ভূতং চরাচরম্ ॥

—২৮।২৩

"শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত লোকের অব্যয় উৎস—তাঁহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব।"

ভীষ্মপর্বে ব্রহ্মার উক্তি এই :—

এতৎ পরমকং ব্রহ্ম এতৎ পরমকং যশঃ।
এতদ্ অক্ষরম্ অব্যক্তম্ এতদ্ বৈ শাশ্বতং মহঃ ॥—৬৬।৬

"কৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম, কৃষ্ণই পরম যশঃ (glory), কৃষ্ণই অব্যক্ত অক্ষর, কৃষ্ণই সনাতন তেজঃ।"

এক কথায়, শ্রীকৃষ্ণ মহেশ্বর, পরমেশ্বর—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

আবার দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য-নারায়ণ বা Solar Logos-এর সহিত অভিন্ন বলা হইতেছে—

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।

তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীৎ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥

—মহাভারত, আদিপর্ব, ৬৭।৭১

—'যিনি দেবদেব সনাতন নারায়ণ, তাঁহারই অংশ নরলোকে প্রতাপশালী বাসুদেব হইলেন।'

অর্থাৎ, এ মতে শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষ্ণু—সূর্য-নারায়ণ (Solar Logos)।

অন্যত্র দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণু বা Planetary Logos বলা হইতেছে—

তথৈব ভৃগুশাপাদ্ বৈ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।

অংশেন ভবিতা তত্র বসুদেবসুতো হরিঃ ॥—দেবীভাগবত

—'ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণু ভৃগুশাপে অংশের দ্বারা বসুদেবপুত্র হইবেন।'

সে জন্যই প্রশ্ন করিতেছিলাম—শ্রীকৃষ্ণ কাঁহার অবতার—বিষ্ণুর, মহা বিষ্ণুর, না মহেশ্বরের ?

সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়—যখন শাস্ত্রগ্রন্থের অনেক স্থলে দেখি, শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ-ঋষির সহিত অভিন্ন বলা হইতেছে—সেই নারায়ণ-ঋষি, যিনি সত্য যুগে সখা নর-ঋষির সহিত বদরিকাশ্রমে দশ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

নরস্ত্বং পূর্বদেহে বৈ নারায়ণসহায়বান্।

বদর্যাং তপ্তবান্ উগ্রং তপো বর্ষাযুতান্ বহূন্ ॥

—মহাভারত, বনপর্ব, ৪০।১

বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয় লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু পাঠককে লক্ষ্য করিতে বলি।

ভীষ্মপর্বে দেখা যায়, ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণৌ পুরুষোত্তমৌ।

সংহতৌ মানুষে লোকে সংভূতাবমিতদ্যুতী ॥—ভীষ্মপর্ব, ৬৬।১১

'সেই পুরাতন অমিততেজাঃ ঋষিশ্রেষ্ঠ নরনারায়ণ সম্প্রতি (দুষ্ট বধের জন্য) মনুষ্যলোকে (কৃষ্ণার্জুনরূপে) আবির্ভূত হইয়াছেন।'

উদ্যোগপর্বেও এই কথার উল্লেখ আছে—

বাসুদেবার্জুনৌ বীরৌ সমবেতৌ মহারথৌ।

নরনারায়ণৌ দেবৌ পূর্বদেবাবিতি শ্রুতিঃ ॥

অজেয়ৌ মানুষে লোকে সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।

এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণঃ ফাল্গুনশ্চ নরঃ স্মৃতঃ ॥

'মহারথ বীর কৃষ্ণার্জুন সেই পূর্ব-দেব নরনারায়ণ। তাঁহারা সংযুক্ত হইলে ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবাসুরেরও অজেয়। সেই নারায়ণ-ঋষি শ্রীকৃষ্ণ এবং নরঋষি অর্জুন।'

নরনারায়ণৌ যৌ তৌ তাবেবার্জুনকেশবৌ।

বিজানীহি মহারাজ! প্রবীরৌ পুরুষর্ষভৌ ॥—উদ্‌যোগ পর্ব, ৯৬।৪৬

'এই যে বীরোত্তম পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ, ইঁহারা সেই নর ও নারায়ণ ঋষি।'

ঐ উদ্‌যোগ পর্বের অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

নরস্তমসি দুর্ধর্ষো হরির্নারায়ণো হ্যহম্।

কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নরনারায়ণাবৃষী ॥

'হে অর্জুন! তুমি দুর্ধর্ষ নর, আমি নারায়ণ হরি। আমরা সেই নর নারায়ণ ঋষি, কালক্রমে এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছি।'

এই সকল উক্তি হইতে জানা যায় যে, যুগ-প্রয়োজনে নর-ঋষি অর্জুনের দেহে আবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং নারায়ণ-ঋষি শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাই যদি হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইলেন কিরূপে?

এ সকল আপাত-বিরোধী মতের সমন্বয় কি? শ্রীকৃষ্ণকে একই নিশ্বাসে যে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বর বলা হইল, তাহারই বা সমাধান কি? এ প্রশ্নের আমি আমার 'অবতারতত্ত্ব' গ্রন্থে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি এবং আদরের সহিত, বৈকুণ্ঠগত পূর্ণেন্দু-নারায়ণ সিংহের 'চৈতন্যকথা' হইতে ঐ ভক্তপ্রবরের মত উদ্ধৃত করিয়াছি :—

'কোথায় গোলোকপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, আর কোথায় আমাদের এই মর্ত্যলোক। এই মর্ত্যলোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ কি সহজ কথা?… তাই ঋষির মধ্যে মহাঋষি, জগতের হিতাকাঙ্খী, ত্রিজগতের গুরু, অর্দ্ধ-মনুষ্য, অর্দ্ধ-দেবতা নারায়ণ ঋষির অপেক্ষা। শ্রীকৃষ্ণের অন্নময় কোষ (physical vehicle) নারায়ণ ঋষি। জন্মের সময়েও তিনি নারায়ণ ঋষি এবং অন্তর্ধানের সময়েও তিনি নারায়ণ ঋষি। বৃন্দাবনলীলায় তিনি গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ। মথুরালীলায় তিনি শ্বেতদ্বীপপতি বিষ্ণু এবং দ্বারকালীলায় তিনি শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ।'

পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের এই কথাগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণরূপধারী নারায়ণ-ঋষির শরীরে যে ঐশ তেজের আবেশ হইত, তাহারও তারতম্য ছিল। মোটামুটি, মথুরালীলায় তিনি যে তেজঃ ধারণ করিতেন, তাহা বিষ্ণুর তেজঃ; দ্বারকালীলায় তিনি যে তেজঃ ধারণ করিতেন, তাহা মহা-বিষ্ণুর তেজঃ, এবং বৃন্দাবনলীলায় তিনি যে তেজঃ ধারণ করিতেন, তাহা মহেশ্বরের তেজঃ। অধিকন্তু ঐ তেজেরও আবির্ভাব তিরোভাব ঘটিত—'যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ'।

এই যে আবেশ—ইহার পাশ্চাত্য নাম control বা possession। *

*এই আবেশ কিরূপে সিদ্ধ হয়, "বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব" অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিব।

বলা বাহুল্য, নারায়ণ ঋষি—যিনি শ্রীকৃষ্ণ অবতারের পার্থিব উপাধি —তিনি ভগবানের 'সাধর্ম্যম্ আগতঃ' সিদ্ধ পুরুষ—"Perfect as our Father in Heaven is perfect:—তাঁহাতে ভগবানের সৎ-ভাব, চিৎভাব ও আনন্দ ভাব, তাঁহার সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তি, তাঁহার প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তাঁহার সমস্ত মানবিক বৃত্তি—কি শারীরিকী, কি জ্ঞানার্জনী, কি কার্য-কারিণী, কি চিত্তরঞ্জিনী—সম্পূর্ণ স্ফূর্ত অথচ সমঞ্জস—এক কথায় তিনি আদর্শ মানব—শুদ্ধ, পূত, অপাপবিদ্ধ। সে জন্যই তিনি কৃষ্ণাবতারে ঐশ তেজের বাহন হইতে পারিয়াছিলেন। অন্যথা শৌণ্ডিকের ভাণ্ড কি স্বর্গসুধার ভাজন হইতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এই ভাবে বুঝিলে সকল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায় এবং আমরা বুঝিতে পারি, কেন ভীষ্মপর্বে ব্রহ্মা কৃষ্ণ সম্পর্কে বলিতেছেন—

তং যোগিনং মহাত্মানং প্রবিষ্টং মানুষীং তনুম্।*
অবমন্যেৎ বাসুদেবং তম্ আহুঃ তামসং জনাঃ॥ —৬৬।২০

আরও বুঝিতে পারি, কেন শাস্ত্রগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে এক নিশ্বাসে নারায়ণ-ঋষি এবং বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু ও মহেশ্বর বলা হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন, সাধারণতঃ (ordinarily) শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য বটেন, তবে আদর্শ মানব—কারণ, সচরাচর তিনি নারায়ণ ঋষি এবং মনুষ্যভাবে কার্য করেন—কিন্তু সময় সময় যখন ঐ 'মানুষী তনু'তে বিষ্ণু, মহাবিষ্ণু বা মহেশ্বরের তেজঃ প্রবিষ্ট হয়—যেমন গীতায় বিশ্বরূপ প্রদর্শনের সময় কিংবা ভাগবতে ব্রহ্মমোহনের সময়—তখন তিনি ভগবান্—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অবতারতত্ত্ব বোঝা প্রয়োজন। অতএব আগামী অধ্যায়ে আমরা অবতার তত্ত্বের আলোচনা করিব।

* রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের প্রসঙ্গেও আমরা শুনিতে পাই:—
যথার্থং রাবণস্যেহ প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্।—যুদ্ধকাণ্ড, ১১১।২৭

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

ধর্ম ও দর্শনের এক প্রধান সমস্যা এই অবতারবাদ। অশরীরী পরমেশ্বরের মনুষ্যশরীর ধারণ সম্ভব কি না? 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। উত্তরে তিনি প্রতিপ্রশ্ন করিতেছেন—

'যিনি ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন?* তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার এ সীমা নির্দেশ কর কেন? ঈশ্বর ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্—'তিনি অবতীর্ণ হইতে পারেন না' এমন কথা বলিলে তাঁহার শক্তির সীমানির্দেশ করা হয় (গীতাভাষ্য)। অবশ্য যাঁহার কটাক্ষমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় সাধিত হয়, কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে তাঁহাকে ভূতলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে।'

তবে অবতার কেন? ঈশ্বরের অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি?

---

* নিপট অদ্বৈতী শঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন—স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্—১।১।২০ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য।

পূর্ণ আদর্শ ভিন্ন প্রকৃত ধর্মসংস্থাপন সম্পন্ন করা অসম্ভব। জীবের সমক্ষে এই পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শনের জন্যই অবতার স্বীকার করিয়া ভগবানের সান্ত ও সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথায় বলি—

'সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না।… অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন।…এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি?' (কৃষ্ণচরিত্র)

পুনশ্চ—

'শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ ইহা ভাবিলে, তাঁহার সকল কার্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্ররূপ রত্নভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শ-পুরুষতত্ত্ব।'

অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বরের অবতার-গ্রহণের প্রয়োজন সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম-সংস্থাপন। বৈজ্ঞানিকপ্রবর স্যর অলিভার লজ্ ভগবানের অবতার-স্বীকারের প্রয়োজন অন্য ভাবে সিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবানের ঐশ্বর্য এতই বিরাট্, তাঁহার প্রভাব এতই প্রচণ্ড যে, তিনি যদি অবতাররূপে নিজেকে সঙ্কুচিত ও সঙ্কীর্ণ না করেন, তবে কেহই তাঁহার অনাবৃত মুখ দর্শন করিতে পারে না। এই জন্যই খ্রীষ্টানেরা বলেন, "No man can see My face and live." দৃষ্টান্তস্বরূপ স্যর অলিভার লজ্ রবি

ও রশ্মির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সূর্য সমস্ত পৃথিবীর প্রাণ—সূর্যরশ্মি দ্বারাই পৃথিবী পুষ্ট, বর্ধিত ও সঞ্জীবিত আছে; কিন্তু কোন দিন যদি সূর্য নিজের প্রচণ্ড মার্তণ্ড মূর্তিতে প্রকটিত হন, তাহার ফলে কি হয়? সমস্ত পৃথিবী মুহূর্তমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হয়। সাগর, নদী, পর্বত, প্রস্তর, প্রান্তর, তরু, লতা, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ—কেহই ক্ষণার্ধ তিষ্ঠিতে পারে না। সেই জন্য সূর্যের তেজঃ বায়ুস্তরের দ্বারা প্রশমিত হইয়া সংবৃত মূর্তিতে রশ্মিরূপে আমাদের গোচর হয়। এই সংবৃতির ফলেই সূর্যের উপকারিতা। ভগবানের সম্বন্ধেও ঠিক্ ঐ কথা। সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই; বোধ হয় অত্যুত্তম সাধকেরাও তাঁহার অনাবৃত ঐশ্বর্য, তাঁহার প্রকটিত মহিমা ধারণ করিতে পারেন না। সেই জন্যই তিনি অবতারের রূপে নিজেকে সংবৃত করিয়া, সেই আবরণের মধ্যে নিজের তেজঃ প্রশমিত করিয়া জীবের নিকট প্রকাশিত হয়েন।

স্যর অলিভার লজের কথাগুলি বেশ সঙ্গত। আমাদের দেশে গঙ্গাবতরণের যে কাহিনী পুরাণের মধ্যে রক্ষিত আছে, তদ্দ্বারা ঐ কথার সমর্থন হয়। গঙ্গাকে বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা বলে। এক দিন সাধকপ্রবর ভগীরথের আবাহনে ভগবানের আধ্যাত্মিক শক্তি ভূমণ্ডলে গঙ্গারূপে অবতরণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই শক্তিকে মনুষ্যের ধারণ-উপযোগী করিবার জন্য প্রথমতঃ মহাদেবকে জটার মধ্যে উহাকে সংবৃত করিতে হইয়াছিল এবং পরে জহ্নুমুনির শরীরের মধ্যে সংগোপিত করিতে হইয়াছিল। সেই জন্য গঙ্গার নাম জাহ্নবী। এইরূপে দ্বিধা-শিথিলিত বিষ্ণুতেজঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলে, তবে গঙ্গা আমাদের ধারণ-উপযোগী হইয়া পতিতপাবনী হইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও 'ধর্মতত্ত্বে' এ বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন :—

"ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি—আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়? অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য; কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন।"

'দেবী চৌধুরাণী'তে একথা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে—

"ঈশ্বর অনন্ত—কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না—সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর—হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।"

ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে অবতারের প্রয়োজন যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক। তিনি বলিতেছেন, শ্রবণ-ও-স্মরণযোগ্য লীলাপ্রকাশ দ্বারা বদ্ধ জীবকে আকর্ষণ ও ভবকূপ হইতে উত্তোলনই অবতারের মুখ্য প্রয়োজন।

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানাম্ অবিদ্যাকামকর্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্ ইতি কেচন ॥—১।৮।৩৫

—'অজ্ঞান, কাম ও কর্ম দ্বারা নিপীড়িত নরনারীকে শ্রবণ-ও স্মরণযোগ্য লীলাপ্রকাশ দ্বারা এই ভবকূপ হইতে উদ্ধরণই—হে কৃষ্ণ! তোমার অবতারগ্রহণের উদ্দেশ্য।'

ভাগবতের অন্যত্রও এ কথা আছে—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

—১০।৩৪।৬৫

এ সম্পর্কে অ্যানি বেসাণ্ট্ অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন :—

When He Who is beauty and love and bliss, shews a little portion of Himself on earth, enclosed in human form, the weary eyes of men light up, the tired hearts of men expand with a new hope and a new vigour. They are irresistably attracted to Him. Devotion spontaneously springs up.

ভগবান্ কিরূপে অবতীর্ণ হন, তাঁহার অবতার-গ্রহণের প্রণালী (*modus operandi*) কি? বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গের বিশেষ আলোচনা করেন নাই। তবে গীতার প্রখ্যাত শ্লোক –

অজোপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরোপি সন্।
প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥—৮।৬

—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্কর ও শ্রীধরের ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'সম্ভবামি আত্মমায়য়া'—শ্রীশঙ্করাচার্য ইহার ভাষ্যে বলেন—

স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদাসম্পন্নঃ ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং প্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানাম্ ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবান্ ইব জাত ইব।

—অর্থাৎ, সেই ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান্ নিজের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে স্ববশে আনিয়া—অজ অব্যয় মহেশ্বর শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব

হইলেও নিজ মায়া দ্বারা যেন দেহী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীধর স্বামী এ সম্পর্কে কিছু ভিন্ন-মত। তিনি বলেন—

ঈশ্বরোঽপি কর্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি • • স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জিতসত্ত্বমূর্ত্যা স্বেচ্ছয়া অবতরামি।

—অর্থাৎ, ভগবান্ কর্মরহিত; তিনি কর্মের অধীন নহেন। তথাপি নিজ মায়া দ্বারা উৎপন্ন হন। তিনি আপনার শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া বিশুদ্ধ উর্জিত সত্ত্বমূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন।

অতএব, শ্রীধর স্বামীর মতে অবতারকালে ভগবান্ মূর্তি পরিগ্রহ করেন, কিন্তু সে মূর্তি শুদ্ধসত্ত্বনির্মিত। গীতার অন্যতর টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী এ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "কেহ কেহ নিত্য নিরবয়ব নির্বিকার পরমানন্দময় ভগবানের অবতারকালে বাস্তব দেহসম্বন্ধ মনে করেন; তাহা সঙ্গত নহে। ভগবান্ নিত্য বিভু সচ্চিদানন্দঘন নির্গুণ পরমাত্মা—তাঁহার কি ভৌতিক, কি মায়িক, কোনরূপ দেহই সম্ভবে না। তবে যে অবতার-কালে তাঁহার দেহিত্ব প্রতীত হয়, তাঁহাকে মূর্তিধারী বলিয়া মনে হয় —তাহা মায়া মাত্র।" অর্থাৎ, সচ্চিদানন্দের সে মূর্তি—পারমার্থিক ত নহেই, প্রাকৃতিকও নহে—তাহা প্রাতিভাসিক মাত্র।

এইরূপ কোন কোন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, যিশুর যে অবতার-শরীর, তাহা অপ্রাকৃত শরীর—তাহা শরীরই নয়—একটা প্রতিভাস (appearance or simulacrum) মাত্র। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, যিশুখ্রীষ্ট বা শ্রীচৈতন্যের শরীরের যে পরিচয় আমরা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে পাই, তাহাতে দেখি, তাঁহাদের অধিষ্ঠিত দেহও আমাদেরই দেহের মত—হ্রাসবৃদ্ধির অধীন, জন্মমৃত্যুর

অধিকৃত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের দেহত্যাগের পর সেই দেহের সৎকার করা হইয়াছিল। যিশুখ্রীষ্টের দেহ ক্রুশে শলাকাবিদ্ধ হইলে তাঁহার সেই ক্ষত হইতে রক্তপাত হইয়াছিল। পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য গয়া গমনকালে চৈতন্যদেবের দেহ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল। অতএব এই সকল অবতারের দেহকে প্রতিভাস বা simulacrum মনে করা কোন মতেই সঙ্গত নয়।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, অবতারের দেহ যদি আমাদেরই মত রক্তমাংসের দেহ হয়, তবে অবতার-গ্রহণের প্রণালী কি? বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা করেন নাই। আমার 'অবতারতত্ত্ব' গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আমি যথাসাধ্য এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছি। অতএব এস্থলে বিস্তার না করিয়া সংক্ষেপে আমার সিদ্ধান্তের বিবৃতি করিব।

বাদ দ্বিবিধ—দ্বৈত ও অদ্বৈত। দ্বৈত-দৃষ্টিতে অবতার গ্রহণের প্রণালী একরূপ—অদ্বৈত-দৃষ্টিতে অন্যরূপ। প্রথম অদ্বৈত-দৃষ্টি বুঝিবার চেষ্টা করি।

এ দেশে আমরা যাহাকে সংবিৎ বলি—পাশ্চাত্য দর্শনে তাহার নাম Consciousness. এই সংবিৎ সাধারণতঃ আমাদের মস্তিষ্ক-দ্বার দিয়াই প্রকাশিত হয়। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সংবিৎ একটা ব্যাপক বস্তু—মস্তিষ্ক-দ্বারে তাহার ভগ্নাংশ ব্যক্ত হয়—অধিকাংশই অব্যক্ত বা subliminal থাকে। সংবিতের এই তথ্য বুঝাইতে তত্ত্বদর্শী মায়ার সাহেব ব্যক্ত সংবিৎকে সাগরে ভাসমান তুষার-স্তূপের সহিত তুলিত করিয়াছেন। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, জলপূর্ণ কাচের গেলাসে এক টুক্‌রা বরফ ছাড়িয়া দিলে ঐ বরফের ভগ্নাংশ মাত্র (বোধ হয়, সাত ভাগের এক ভাগ) জলের উপরে ভাসে—

বাকি অংশ জলের নীচে ডুবিয়া থাকে। তুষারস্তূপের সম্বন্ধেও ঐরূপই দেখা যায়। শীতপ্রধান উত্তর-সমুদ্রে গ্রীষ্মঋতুর আরম্ভে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের পাহাড় ভাসিয়া আসে। ঐ সকল পাহাড়ের দশ হাত যদি জলের উপরে ভাসে, তবে অন্ততঃ ৭০ হাত জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদেরা এখন বলিতেছেন, জীব-সংবিৎও ঐরূপ। ইহা একটা প্রকাণ্ড বস্তু, কিয়দংশ মাত্র মস্তিষ্কের দ্বারা প্রকাশিত হয়—যাহাকে brain consciousness বলে। ইহাই যেন বরফস্তূপের জলের উপরিভাগে ভাসমান ভগ্নাংশ; কিন্তু ইহার অধিকাংশ subliminal, অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় অব্যক্ত থাকে—ইহাই যেন বরফ-স্তূপের জলমগ্ন অবশিষ্টাংশ। দিব্যদৃষ্টি, প্রাগ্‌দৃষ্টি, সাইকোমেট্রি, সফল স্বপ্ন, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি ব্যাপারে ঐ subliminal সংবিৎ (যাহা জাগ্রদ্দশায় অব্যক্ত বা subliminal ছিল), সেই সংবিৎ উপরে কতকটা ভাসিয়া উঠে এবং আমরা ঐ ব্যাপকতর সংবিতের (larger consciousness-এর) ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হই। এই subliminal consciousness সম্বন্ধে স্যর অলিভার লজ লিখিয়াছেন—

The doctrine is roughly that we are each of us larger than we know; that each of us is only a partial incarnation of a larger self. The individual, as we know him, is an incomplete fraction....The incarnate fraction varies in different individuals, from something almost insignificant to something rather magnificent and striking, but in no case is the whole self manifested in any given individual.—*Making of Man.*

অর্থাৎ, মস্তিষ্কের দ্বার দিয়া আমাদের যেটুকু প্রকাশিত হয়,

আমরা প্রত্যেকে তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। এই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দ্বারা আমাদের ব্যাপকতর সংবিতের পরিমাণ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র; কারণ, brain consciousness (যাহাকে এদেশের ভাষায় জাগ্রৎ-সংবিৎ বলা হয়)—সমস্ত জীবের কতটুকু?

সেই জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা জাগ্রৎ-সংবিতের উপর স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এবং যোগসিদ্ধের পক্ষে তুরীয় ও নির্বাণ সংবিতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, নির্বাণ অবস্থাতেই সংবিতের সম্পূর্ণ সম্প্রসারণ হয়। স্যর অলিভার লজও বলিলেন, সংবিতের ব্যাপকতার ইয়ত্তা করা যায় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 'শারীর' সংবিৎ এত বৃহৎ ভাবে ব্যক্ত হয় যে, আমরা তাহার মহীয়সী প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সমাদর করি।*

এই যে ব্যাপক সম্বিৎ, অদ্বৈতবাদীর মতে উহাই ব্রহ্ম—উহার উদয়াস্ত নাই, অপচয়-উপচয় নাই, উহা অখণ্ড অদ্বয়। কেবল উপাধির ভেদে ঐ ব্রহ্ম-জ্যোতির প্রকাশের তারতম্য—বস্তুতঃ তাহার প্রভেদ বা পরিচ্ছেদ নাই—উপাধির্ভিন্নতে ন তদ্বান্। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্
আপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্

—'এক সূর্য যেমন বিভিন্ন জলাধারে বহুরূপে প্রতীয়মান হন—ইহাও তদ্রূপ।'

---

* How large a subliminal self may be, one does not know. .. In some cases it may happen that the portion incarnate is so great that the embodied personality exhibits the phenomenon of transcendent genius and is by universal consent accounted 'a great man.'—*Making of Man.* Ch. ix.

একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি বিশদ হইতে পারে। ধরুন, একটা প্রকাণ্ড ডোমের মধ্যে একটি মহোজ্জ্বল তাড়িতবর্তি রাখা গেল। ডোমটি কতকগুলি পর্কলা দ্বারা গঠিত—কেহ অস্বচ্ছ, কেহ অর্ধ-স্বচ্ছ, কেহ স্বচ্ছ—কয়েকটি পর্কলা রঙীন, দুই একটি শ্বেত-শুভ্র। এরূপ স্থলে ডোমের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতির প্রকাশে তারতম্য ঘটিবে না কি?

যে পর্কলাগুলি অস্বচ্ছ (opaque)—তাহাদের মধ্য দিয়া ঐ জ্যোতিঃ প্রায় অপ্রকাশই থাকিবে। যে পর্কলাগুলি অর্ধ-স্বচ্ছ, তাহাদের মধ্য দিয়া জ্যোতির আংশিক প্রকাশ হইবে মাত্র। আর যেগুলি প্রায় স্বচ্ছ, যদি মাজিয়া ঘসিয়া তাহাদিগকে বেশ স্বচ্ছ করা যায়—তবে তন্মধ্য দিয়া জ্যোতির পূর্ণ প্রকাশ হইবে। এইরূপ রঙীন পর্কলাগুলি জ্যোতির সহজ শুভ্রতাকে রঞ্জিত করিবে। কিন্তু যে পর্কলা শ্বেতশুভ্র, তাহার মধ্য দিয়া যে জ্যোতিঃ বহির্গত হইবে, তাহার প্রকাশ অবিকৃত থাকিবে।

অদ্বৈতবাদী বলেন, আমরা প্রত্যেকে ঐরূপ এক একটি পর্কলা। যে অখণ্ড ব্রহ্মজ্যোতিঃ অপ্রাকৃত ধামে চির জ্যোতিষ্মান্—সেই জ্যোতিঃ প্রপঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন জীব-পর্কলার উপাধিযোগে বিচিত্র আকারে ও বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু যদি কোন উপাধি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়, যদি কোন পর্কলার সমস্ত মলা মলিনতা বিধৌত হইয়া সে একেবারে অনাবিল, একান্ত শ্বেতশুভ্র হয়—তবে সেই দ্বার দিয়া ব্রহ্মজ্যোতির যে অবাধ মহিমা ও অপার ঐশ্বর্য প্রকটিত হইবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? আমরা যাঁহাদের অবতার বলি, তাঁহারা ঐরূপ একান্ত অনাবিল শ্বেতস্বচ্ছ পর্কলা—সে জন্য তাঁহাদের মধ্য দিয়া ব্রহ্মজ্যোতির যে

প্রকাশ হয়, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া লোক আনন্দে উৎফুল্ল ও ভক্তিতে উদ্বেল হইয়া উঠে। অদ্বৈত-দৃষ্টিতে ইহাই অবতার-তত্ত্ব।

এইবার দ্বৈত-দৃষ্টির কথা বলি। অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন —অদ্বৈতবাদের মহাবাক্য—সোঽহং, তত্ত্বমসি।

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ—উপনিষদ্

দ্বৈতবাদে কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকৃত—

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ ঈশানীশৌ—শ্বেতাশ্বতর

'জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন—জীব অজ্ঞ অনীশ্বর, ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ঈশ্বর।' কেবল তাহাই নয়—বিভিন্ন শরীরের অধিষ্ঠাতা বা চালক জীব ভিন্ন ভিন্ন। আমার দেহপুরীর স্বামী আমি—আপনার দেহপুরীর স্বামী আপনি। আপনি ও আমি স্বতন্ত্র।

কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ ঘটনা বিরল নয় যে, কখন কখনও এক জীব অন্য জীবের দেহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া প্রকৃত মালিককে স্থানচ্যুত বা বেদখল করে। এ ব্যাপারকে আমরা এদেশে 'আবেশ' বলি—পশ্চিমে ইহার নাম Control বা Possession.

What is meant is that the human body may become separate from its ordinary tenant and another tenant may step into it.—Annie Besant.

এই আবেশ সম্পর্কে মায়ার সাহেব তাঁহার *Human Personality* -গ্রন্থে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন—কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত এই :—

If we analyse our observations of possession, we find two main factors—the central operation, which is the control by a spirit of the sensitive's organism and the

indispensable pre-requisite which is the partial and temporary desertion of that organism by the percipient's own spirit.

অর্থাৎ, আবেশস্থলে পর পর দুইটি ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায় :— প্রথমতঃ যিনি আবেশের পাত্র হইবেন, তাঁহার সংবিৎ বা আত্মা স্বীয় দেহ ছাড়িয়া সাময়িকভাবে বাহিরে অবস্থান করে এবং সেই সুযোগে আগন্তুক আবেশকারীর সংবিৎ বা আত্মা (spirit) সেই শূন্য পুরীতে প্রবেশ করিয়া ঐ আবিষ্টের শরীর দখল করিয়া বসে। ভূতাবেশস্থলে আরও দেখা যায় যে, কখন কখন ভূত বা প্রেত বলপূর্বক মালিককে বেদখল করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে এবং মালিক নিজের দখল বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। তখন উভয়ের মধ্যে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহারই ফলে আবিষ্টের দেহে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ-সকল ফুটিয়া উঠে।

প্রেততত্ত্ববাদী বা স্পিরিচুয়ালিষ্ট্‌দিগের বৈঠকে (seance-এ) 'মিডিয়মে'র দেহে আগন্তুক প্রেতের আবেশ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ঐ অবস্থায় প্রায়ই মিডিয়ম অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং তাহার মধ্যে ঐ আগন্তুক প্রেত আংশিক বা পূর্ণ ভাবে প্রবেশ করে। কেহ কেহ আবেষ্টা যে আবিষ্ট হইতে ভিন্ন ব্যক্তি—এ কথা স্বীকার করিতে চান না—তাঁহারা বলেন, ঐ ঐ স্থলে আবিষ্টের Personalityর একাংশই আবেষ্টারূপে প্রতীয়মান হয়। মায়ার্স এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন—আবেশস্থলে আবিষ্টের আত্মা অন্ততঃ আংশিক ভাবে তাহার স্থূল শরীর ত্যাগ করিলে কোন আগন্তুক আত্মা তাহার দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ শরীরের চালনা করে।

The automatist (আবিষ্ট), in the first place, falls into

a trance, in which his spirit partially quits his body ··· so as to leave room for an invading spirit to use it in somewhat the same fashion as its owner is accustomed to use it.

এ কথার প্রমাণে মায়ার্স বলেন—আবেশকারী যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহার লেখার ছাঁদে, কথার স্বরে, বাক্যের ভঙ্গিতে তাহা প্রমাণিত হয়। কখনও বা আবিষ্টের সম্পূর্ণ অজানা সংবাদ তাহার বচনে বা লিখনে প্রকাশিত হয়।

The controlling spirit proves his identity mainly by reproducing in speech or writing, facts which belong to his memory and not to the automatist's memory. He may also give evidence of supernormal perceptions of other kinds.

পাশ্চাত্য প্রেততাত্ত্বিকেরা প্রেতের সমস্যা লইয়া এতই ব্যস্ত যে, প্রেত ভিন্ন অন্য জীবের যে আবিষ্টের দেহে আবেশ ঘটিতে পারে, এ কথা তাঁহারা আলোচনা করিবার বা লক্ষ্য করিবার অবসর পান না। কিন্তু ভূতাবেশ যেমন প্রমাণসিদ্ধ, দেবাবেশও সেইরূপ প্রমাণসিদ্ধ। অনেকস্থলে উন্নত পুরুষ, কখনও বা মুক্ত পুরুষ—কোন কোন শুদ্ধ আধারে আবিষ্ট হন। এ সম্বন্ধে এদেশের ও বিদেশের ধর্মসাহিত্য বহু প্রামাণিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

'শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে' দেখা যায়, শঙ্করাচার্য কামকলা শিক্ষার জন্য অমরু রাজার দেহে প্রবেশ করিয়া কয়েক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতে তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ সম্বন্ধে এই ধরণের ঘটনার উল্লেখ আছে। বিশ্বরূপ বেশ উন্নত সাধক ছিলেন।

প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্।
আজন্ম বিরক্ত সর্ব গুণের নিদান ॥
নিরবধি থাকে সর্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥—চৈতন্যভাগবত

এই বিশ্বরূপ যৌবনে বিরাগী হইয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন এবং কয়েক বৎসর মধ্যে পুণার সন্নিহিত পান্‌ঢারপুরে দেহরক্ষা করেন। বৈষ্ণবগ্রন্থের বর্ণনায় জানা যায়, বিশ্বরূপের তিরোধানের পর যখন শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন, তখন তাঁহার লীলায় সহায়তা করিবার জন্য বিশ্বরূপ নিত্যানন্দের শরীরে প্রবেশ করিলেন।

মূর্তিভেদে জন্মিলা আপনি নিত্যানন্দ।—চৈতন্যভাগবত

এই আবেশের ফলে নিত্যানন্দের আকৃতি এমনভাবে পরিবর্তিত হইত যে, শচীমাতা অনেক সময় নিত্যানন্দকে বিশ্বরূপ বলিয়া ভ্রম করিতেন।

হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর ॥—চৈতন্যভাগবত

যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর নীলাচলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং নিত্যানন্দকে বাংলা দেশে প্রচারকার্যে নিয়োজিত করিলেন, তখন দুই জনের মধ্যে বিচ্ছেদ হইল। তখন বিশ্বরূপ কি করিলেন? তিনি নিত্যানন্দের শরীর ছাড়িয়া পরমানন্দপুরীর দেহে আবিষ্ট হইলেন। সেই জন্য দেখিতে পাই, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে মহাপ্রভু বলিতেছেন :—

অহো পরমানন্দপুরীশ্বরঃ তাবন্মুনীন্দ্রমাধবপুরীশ্বরস্য শিষ্যঃ, যত্র খলু অগ্রজস্য বিশ্বরূপস্য সমগ্রম্ ঐশ্বরং তেজঃ প্রবিষ্টম্।

খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে যে নষ্টিক্ (gnostic) সম্প্রদায় আছে, সেই সম্প্রদায়ের লোকদিগের পূর্বাপর বিশ্বাস যে, যিশু ও খ্রীষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি এবং মেরীর পুত্র যিশুর প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত তত্ত্ব ক্রাইষ্টের আবির্ভাব হইয়াছিল। ক্রাইষ্ট যিশুর দেহে তিন বৎসর মাত্র বসতি করিয়া লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। ম্যাথু ও জনের কাহিনীতে দেখা যায়, যিশু যখন যৌবনের মধ্যসীমায় উপনীত, তখন জন্ দি ব্যাপটিষ্ট্ তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। জন্ যিশুকে দীক্ষাদান করিলে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া ঐশ তেজঃ (Spirit of God) সুপর্ণের রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করিল এবং যিশুর উপর আপতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হইল,—"এই আমার প্রিয়পুত্র, আমার অশেষ প্রীতি-ভাজন।"

Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptised of him. ...And Jesus, when he was baptised, went up straitway out of the water: and lo, the heavens were opened unto him and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him.

And lo! a voice from heaven saying, 'This is My beloved Son, in whom I am well pleased.'—Matthew, Ch. III, 14, 16-7.

যাহাকে আমরা অবতার বলি, সেও এইরূপ আবেশের ব্যাপার। যিনি অবতীর্ণ হন—তা তিনি পুরুষোত্তম ভগবান্ই হউন অথবা ভগবানের সাধর্ম্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষই হউন—তিনি ব্যক্তিবিশেষের দেহে আবিষ্ট হন। অর্থাৎ, ঐ দেহ তাঁহার সাময়িক বাহন বা উপাধি হয়। অবশ্য ঐ দেহ শুদ্ধ, পূত, অপাপবিদ্ধ হওয়া চাই। ভূতাবেশ

স্থলে আগন্তুকের অনধিকার প্রবেশ, কিন্তু অবতার স্থলে নির্ব্বাচিত বাহন স্বেচ্ছায় স্বদেহ সাময়িক ভাবে নিবেদন করেন এবং অবতার সেই দেহে আংশিক বা পূর্ণরূপে প্রবেশ করিয়া নিজের মহিমা ও মাধুর্য প্রকাশিত করেন। দ্বৈতদৃষ্টিতে ইহাই অবতার গ্রহণের প্রণালী।

আমার 'অবতার-তত্ত্বে' আমি যিশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব, পরশুরাম, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কিত প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই আবেশ-তত্ত্ব বিশদিত ও প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না।

অবতার সম্পর্কে আরও অনেক বক্তব্য আছে, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা আলোচ্য নয়।



পরিশিষ্ট

'ক' পরিশিষ্ট

গীতার কথা

(১৩২২ সাল বৈশাখের 'নারায়ণ' হইতে পুনর্মুদ্রিত)

সে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসরের কথা—যেদিন প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়াছিলাম। তখন বঙ্কিমবাবু ডেপুটীগিরি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, পটলডাঙ্গার প্রতাপ চাটুয্যের লেনস্থ বাটীতে বাস করিতেছিলেন।

ইহার পূর্বেও দুই তিনবার প্রকাশ্য সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল—কিন্তু তাহা দূর হইতে; আলাপ পরিচয় ঘটে নাই। আমি তখন বঙ্কিমচন্দ্রের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলাম—'ছিলাম' কেন বলি, এখনও আছি। যখন স্কুলে পড়ি, সেই অবস্থাতেই ভক্তির পূর্বরাগে হৃদয় আপ্লুত হইয়াছিল। অতএব প্রথম দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্ভ্রমমিশ্রিত ভক্তিভরে প্রণাম করিয়াছিলাম। আমার তখনকার অবস্থা সেক্স্‌পীয়র অমর ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন—

Thus, Indian-like

* * I adore

The sun, that looks upon his worshipper

But knows of him no more.

এই ভাবে কত বৎসর কাটিয়াছিল; ইতিমধ্যে আমি কলেজ ছাড়িয়া কর্মক্ষেত্রে প্রায় প্রবিষ্ট হইতে বসিয়াছিলাম; এমন সময়

ভাগ্যদেবী একদিন আমাকে বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় উপনীত করাইলেন।

উপলক্ষটা বলি। ইহার কিছুদিন পূর্বে আমরা শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। লিওটার্ড নামে একজন আধা-ইংরাজ আধা-ফরাসী সহৃদয় ভারতভক্ত সাহেব ও আমার স্বর্গগত বন্ধু ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী ইহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। আমিও একজন ছোটখাট পাণ্ডা ছিলাম। তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নাম ছিল—The Bengal Academy of Literature। ইহার সভাপতি ছিলেন রাজা বিনয়কৃষ্ণ। বঙ্কিমবাবু যাহাতে এই সভার সহিত সংযুক্ত হন, তজ্জন্য আমাদের সকলেরই আগ্রহ ছিল। তাঁহার সম্মতিগ্রহণরূপ দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হইয়া, তাই কোন এক অপরাহ্নে আমি বঙ্কিমবাবুর পটলডাঙ্গার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আমার সঙ্গী ছিলেন—'যৌবনে যোগিনী' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনিই ছিলেন প্রধান দূত—আমি সহকারী মাত্র।

গোপালবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সুপরিচিত, কতকটা স্নেহপাত্রও ছিলেন। তিনি তখন কবিবর ঈশ্বরগুপ্তের রচনাবলির সংগ্রহ ও সম্পাদনে নিযুক্ত ছিলেন—বঙ্কিমবাবু ইহার ভূমিকা লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ অপরিচিত। অতএব এই উপদূতের কার্য করিতে আমি বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম। বিশেষতঃ তখন পর্যন্ত আমি 'সাহিত্যিক' বলিয়া পরিচিত হই নাই, যদিও তৎপূর্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি 'সাহিত্যে' ধারাবাহিকরূপে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। কারণ, আমার স্মরণ আছে, ইহার কিছুদিন পরে কোনও বিজ্ঞ সমালোচক

নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্রের' সমালোচনা উপলক্ষ্য করিয়া আমাকে সাহিত্যক্ষেত্রে 'নবজাত শিশু' বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমবাবুর পটলডাঙ্গার বাসায় উপস্থিত হইয়া আমরা যথারীতি সংবাদ দেওয়ার পর তাঁহার দ্বিতল কক্ষে নীত হইলাম। আমি সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিলে, গোপালবাবু আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্মিতমুখে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলিলেন। অল্পক্ষণ কথাবার্তার পর তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"দেখুন, 'সাহিত্যে' আপনার যে 'কালিদাস ও সেক্‌স্‌পীয়র" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা আমি যত্ন করিয়া পড়িয়াছি।" বলা বাহুল্য, আমি ইহাতে বিশেষ সম্মান বোধ করিলাম। আমি বলিলাম, 'মাসিকে প্রকাশিত প্রবন্ধ সব আপনি পড়েন না কি?' বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "হাঁ, অনেকই দেখিতে হয় বই কি! কোথায় কোন নূতন লেখকের উদয় হইতেছে, তাহার সংবাদ রাখিতে ইচ্ছা করি।" প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমবাবু শুনিলেন যে, আমি শীঘ্রই কর্মক্ষেত্র ওকালতিতে প্রবিষ্ট হইব। তাহাতে তিনি কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, "তাহা হইলে আপনাকে আমরা সাহিত্যক্ষেত্র হইতে হারাইব।" আমি নির্বন্ধ করিয়া বলিলাম যে, "তাহা কেন? আমি সাহিত্যচর্চা কিছুতেই ছাড়িব না।" বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না যে Law কিরূপ exacting mistress। বিশেষতঃ যে উকীলের সাহিত্য-চর্চারূপ দুর্নাম রটে, মক্কেল তাহাকে দূর হইতে পরিহার করে।" বলা বাহুল্য বঙ্কিমবাবুর উপদেশে আমি তখন মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। যাহা হউক, এই পচিশ বৎসর ধরিয়া আমি কায়ক্লেশে উভয় কূলই বজায় রাখিয়াছি।

এইবার গোপালবাবু নানারূপ ভূমিকা করিয়া আমাদিগের দৌত্য পেশ করিলেন। তীক্ষ্নদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র কথার আবরণ ভেদ করিয়া, আরম্ভেই আমাদের দৌত্য নামঞ্জুর করিলেন, এবং সাহিত্য পরিষদ্ কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে কয়েকটি সারগর্ভ উপদেশ দিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, যখন ভূদেব বাবু জীবিত রহিয়াছেন, তখন আর কেহই Bengal Academy of Literature-এর সভাপতি হইতে পারেন না। সভার কার্য আরও অগ্রসর হইলে এবং সভার কিছু সফলতা দেখিলে, তিনি সভায় যোগদান করিবেন কি না, স্থির করিবেন। আমাদের দৌত্য এইখানেই শেষ হইল। কিন্তু প্রতিগমনের পূর্বে বঙ্কিমবাবুর সহিত গীতা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা কহিবার সুযোগ করিয়া লইলাম।

ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে বঙ্কিমবাবু গীতার বিশেষ আলোচনা করিতেছিলেন। কেবল 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র' নহে—তিনি বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজের জন্য গীতার এক অভিনব ভাষ্যও রচনা করিতেছিলেন, এবং ইহার কিয়দংশ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিতও হইয়াছিল। আমিও তখন গীতার কিছু কিছু আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে, তাঁহার ধারণা এই যে, গীতার শেষ ছয় অধ্যায় পরবর্তী কালের যোজনা, উহারা মৌলিক গীতার অন্তর্গত নহে। তিনি আরও বলিলেন যে, শেষ ছয় অধ্যায়ের ভাষার ভঙ্গী দেখিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না; বিশেষতঃ বিশ্বরূপ-দর্শনেই গীতার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত।

বঙ্কিমবাবুর কথা নিঃসার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এ সম্বন্ধে পরে

আমি অনেক ভাবিয়াছি। তাহাতে আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, বঙ্কিম বাবুর মন্তব্য ভিত্তিহীন নহে। গীতার মর্মান্তিক ঘটনা অর্জুনের মোহ। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলে, বিপক্ষ পক্ষে আত্মীয় স্বজন অবস্থিত দেখিয়া অর্জুনের চিত্তমোহ উপস্থিত হয়, এবং তিনি ধর্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতে উদ্যত হইয়া করুণ-স্বরে পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন,—

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ! ন চ রাজ্যং সুখানি চ।

তিনি আরও বলেন যে, বরং কৌরবেরা তাঁহাকে নিশিত শরে নিহত করুক, তিনি তাহাদের অঙ্গে অস্ত্রপাত করিবেন না।

এবমুক্ত্বাঽর্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥

অর্থাৎ, এই বলিয়া অর্জুন রণস্থলে সশর ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়া শোকাকুলচিত্তে রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। ইহারই নাম অর্জুনের মোহ। গীতা ইহার নাম দিয়াছেন 'কশ্মল'।

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম।"

এই 'কশ্মল' হইতেই গীতার আরম্ভ। অর্জুনের মোহ অপনোদন করিয়া তাঁহাকে ধর্মযুদ্ধে প্রবর্তিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ তাঁহাকে বহুবিধ উপদেশ দিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, মৌখিক উপদেশে সে মোহ তিরোহিত হইল না, তখন তিনি আপনার বিশ্বরূপ অর্জুনকে প্রদর্শন করাইলেন। এই বিশ্বরূপের বর্ণনায় গীতার একাদশ অধ্যায় নিযুক্ত। সেই বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুনের মোহ তিরোহিত হইল। তাহার পর তিনি বলিলেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত!
স্থিতোঽস্মি গত-সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

"আমার মোহ অপনীত হইয়াছে। হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমি স্মৃতি লাভ করিয়াছি। আমার সন্দেহ তিরোহিত হইয়াছে। আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব।"

আমার বিশ্বাস, গীতা মূল মহাভারতের অন্তর্গত ছিল এবং এই বিশ্বরূপ-দর্শনই গীতার মুখ্য ঘটনা ছিল। মহাভারতের আদি পর্বে যে ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ আছে, উহা সম্ভবতঃ মূল মহাভারতের সার সংগ্রহ। এই ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের একটি শ্লোক এই—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন যে, "যখন শুনিলাম যে, অর্জুন 'কশ্মল'-গ্রস্ত হইয়া 'রথোপস্থে' অবসন্ন হইয়া উপবিষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিজ শরীরে সমস্ত লোক দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা করিতে পারি নাই।"

ভগবদ্গীতার বক্তা সঞ্জয়ও বলিতেছেন যে, ব্যাসের প্রসাদে তিনি কৃষ্ণার্জুনের সেই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং—

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্! হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥

"শ্রীহরির সেই অদ্ভুত রূপ পুনঃ পুনঃ আমার স্মরণে আসিতেছে, এবং তাহা স্মরণ করিয়া আমি পুনঃ পুনঃ বিস্ময় ও হর্ষ অনুভব করিতেছি।"

এখানেও বিশ্বরূপ দর্শনের কথা। এই বিশ্বরূপ দর্শনে যাহার

মোহ দূর না হয়, তাহাকে সাংখ্যের ত্রিগুণ-তত্ত্ব ও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকের প্রভেদ বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। অতএব বঙ্কিমবাবু যে গীতার শেষ ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত মনে করিতেন, ইহা অসঙ্গত নহে। বাস্তবিক বিশ্বরূপ-দর্শনেই গীতার পরিসমাপ্তি। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তবে দ্বাদশ অধ্যায়—যাহাতে ভক্তের ও ভক্তির শ্রেষ্ঠ পরিচয় আছে, এবং যাহাকে বঙ্কিমবাবু গীতার মৌলিক অংশ বিবেচনা করিতেন এবং যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত ভক্তির স্থূল কথা এই। এরূপ উদার এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই। সেইজন্য ভগবদ্গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ"—সেই দ্বাদশ অধ্যায়ের কি গতি হইবে? আর ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গীতার শেষ ছয় অধ্যায়েও এমন কয়েকটী শ্লোক আছে, যাহার ধ্বনি মূলগীতার ধ্বনির অনুরূপ।* আমার মনে হয়, এ সমস্যার পূরণ এই যে, মূল ভগবদ্গীতা (যাহার প্রতি ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে লক্ষ্য করা হইয়াছে)—তাহার অধ্যায় ও শ্লোক সংস্থান (arrangement) অনুরূপ ছিল। গীতার বর্তমান আকারে পুনঃ-সংস্থানের সময় কতকগুলি শ্লোক বিপর্যস্ত হইয়া দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের স্থানে স্থানে নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বঙ্কিমবাবুর একথা ঠিক যে, বিশ্বরূপ দর্শন-অধ্যায়েই গীতার পরিসমাপ্তি।

---

* দৃষ্টান্ত স্বরূপ চতুর্দশ অধ্যায়ের ২২-২৬ শ্লোক, ১৫ অধ্যায়ের ৫-৬ ও ১২-১৮ শ্লোক এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫১ হইতে ৬৬ শ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বঙ্কিমবাবুর কথা বলিতে গিয়া গীতার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া বসিলাম। কিন্তু ঐদিন বঙ্কিমবাবু গীতার শেষ ছয় অধ্যায় সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা গীতার পাঠক ও সমালোচক-বর্গের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঐদিন বঙ্কিমবাবুর সহিত গীতার প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন যে, তদানীন্তন ভারতীয় সুধী-সমাজে কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ নামে যে বিভিন্ন সাধনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, গীতাকার অদ্ভুত প্রতিভাবলে তাহার অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর মুখে এই আমি প্রথম গীতার সমন্বয়বাদের সন্ধান পাইলাম। পরবর্তীকালে আমি ইহার যথেষ্ট সম্প্রসারণ করিয়াছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার আদিম উপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। অতএব তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করি।

'খ' পরিশিষ্ট

সভাপতির অভিভাষণ

(পাইকপাড়া রাজবাটীতে অনুষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-উৎসবে পঠিত)

ভদ্র মহোদয়গণ! মহিলাগণ! আজ ২৬শে চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতিথি। ইং ১৮৯৪, ৮ই এপ্রিল বঙ্কিমচন্দ্র ৫৬ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে তিরোধান করেন। ঐ দিনকে তাঁহার মৃত্যুদিন না বলিয়া, বৈষ্ণবী ভাষায় 'বিজয়-বাসর' বলিতে চাই। যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মত যুগপ্রবর্তক পুরুষ—তিনি কালজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়—তিনি অজর অমর হইয়া কল্পকাল যশঃশরীরে অবস্থান করেন—তাঁহার আবার মৃত্যু কি?

সর্বহর কাল তাঁরে না পারে হরিতে
বিজয় লুটায় পদে জেতারে বরিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐরূপই জেতা ছিলেন—তিনি সাহিত্যরথীদিগের রথীত্তম—অপরাজিত জেতা—রথীনাং ত্বা রথীতমং জেতারম্ অপরাজিতম্।

বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন জন্মগ্রহণ করেন (১৮৩৮, ২৭শে জুন—বঙ্গাব্দ ১২৪৫, ১৩ই আষাঢ়) সাহিত্য-পল্লীতে সেটি স্মরণীয় দিন—ঐ দিন আকাশে কিন্নর-গন্ধর্বেরা নিশ্চয়ই দুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিল—দেব-বালারা অলক্ষ্যে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল—স্বর্গে মহোৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছিল। আগামী ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের শত-বার্ষিকী। ঐ শত-বার্ষিকী সুসম্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিপুল উদ্‌যোগ-আয়োজন করিতেছেন—দেশের প্রত্যেক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানকে এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগকে উৎসবের অংশভাগী হইবার জন্য

আমন্ত্রণ করা হইতেছে। সারা বাংলা দেশে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বঙ্গের বাহিরেও নানা স্থান হইতে সহযোগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্রুত P. E. N. -সঙ্ঘ পরিষদের প্রচেষ্টার সহিত সম্মিলিত হইবেন, এরূপ আশা পাওয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা—বাংলা ইংরেজী, গদ্য পদ্য, প্রকাশিত অপ্রকাশিত, উপন্যাস প্রবন্ধ নিবন্ধ চিঠিপত্রের একটি নির্ভুল ও scholarly সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া মুদ্রণকার্য আরম্ভ হইয়াছে। ঐ শত-বার্ষিকী উৎসবের উপক্রমরূপে আজ এই পাইকপাড়া রাজবাটীতে কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ সাহিত্য-পরিষদের সহযোগিতায় তিন দিবস ব্যাপী বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস এই উৎসব বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইবে, এবং মাইকেল-যুগে রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির ও সমৃদ্ধির জন্য যেরূপ সহায়তা করিয়াছিলেন, কুমার বিমলচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় সেই অবদানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন—সেই রুদ্ধ স্রোতঃ পুনরায় উৎসারিত করিবেন। পরিষদের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার পরিমাপ করিতে পারি, এমন যোগ্যতা আমার নাই। তিনি কেবল তো উপন্যাস-রাজ্যের অধিরাজ ছিলেন না—তিনি বঙ্গ সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট্। নবীনচন্দ্রের ভাষার অপপ্রয়োগ করিয়া কেহ কেহ ইদানীং বলিতেছেন বটে—

"এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে
সাহিত্যের সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।"

এ কথা কিন্তু ঠিক নয়—আমার বিশ্বাস বঙ্কিমের রাজাসন চিরকাল শূন্যই থাকিবে—এবং পরবর্তী-গণ সেই শূন্য সিংহাসনের উপর ছত্র

ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের আদর্শ-ভ্রাতা অমিতকীর্তি ভরতের মত আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা নানা খাতে প্রবাহিত হইয়া বাংলা সাহিত্যকে পীন ও পুষ্ট করিয়াছিল। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বারা সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ঐ প্রচেষ্টা যে অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, একথা অসংকোচে বলা যায়। এ সম্পর্কে তাঁহার নিজের কথা এই—

"যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেন্যাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।"

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে নিজের 'মজুরদারি'র উল্লেখ করিলেন—ইহা বিনয়ের পরাকাষ্ঠা বটে, কিন্তু এ আত্মগ্লানি অনাবশ্যক। প্রকৃত কথা এই, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী ছিল—সেই জন্য তিনি একাধারে কবি, শিল্পী, সমালোচক, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, দার্শনিক, সামাজিক ও ধর্মবেত্তা ছিলেন।

১২৭১ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৬৫) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। ইহাই তাঁহার প্রথম বাংলা মুদ্রিত রচনা। তৎপূর্বে তিনি তাঁহার ইংরেজী নভেল "Rajmohon's Wife" 'Indian Field'-নামক সাপ্তাহিকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখনও এদেশে ইংরেজীর একাধিপত্য—আকাশে বাতাসে পাশ্চাত্য ভাবের অবিরত ক্ষরণ। সাধে কি শিক্ষিতের প্রতিভূ হইয়া নিমচাঁদ বলিয়াছিলেন—'I dream in English'। কিন্তু শীঘ্রই বঙ্কিমচন্দ্রের

ঐ মোহ কাটিয়া যায়। তিনিও বোধ হয় মধুসূদনের মত স্বগত বলিয়াছিলেন—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন—
তা' সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

এবং প্রতিক্রিয়ার পূর্ণ আবেগে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র অনুষ্ঠানপত্রে লিখিয়াছিলেন—"আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম-স্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না।"

ইহার পরও দেখি বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজীর প্রতি অযথা পক্ষপাত জন্য বাঙ্গালীকে তীব্র তিরস্কার করিতেছেন—

"আজিও নাকি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে,—যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে এবং আপনাকে মাতৃভাষা-অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজীনবিশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পায়।"

ঐ 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন বন্ধু রমেশচন্দ্র ১৩০১ সনের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় এইরূপ লিখিয়াছেন—

"যখন 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ক কিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা, এবং

পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে, একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, একটি নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।"

ইহার পর ১৮৬৬ সালে 'কপালকুণ্ডলা' ও ১৮৬৯ সালে 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হইল। তখন বাঙ্গালী পাঠকের ঐ চমক স্থায়ী বিস্ময়ের আকার ধারণ করিল। 'কপালকুণ্ডলা' সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—

"এমন অছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতাশূন্য অথচ রসপরিপূর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখায় ওতপ্রোত কাব্যগ্রন্থ বাংলায় নাই।"

'মৃণালিনী'র কথা বিশেষ কিছু বলিব না—তবে 'গিরিজায়া' ও 'দিগ্‌বিজয়' এবং দেশদ্রোহী 'পশুপতি'র অন্তিমের মর্মভেদী আত্মগ্লানি বাঙ্গালী পাঠক কোন দিন ভুলিতে পারিবে না।

ইহার পর ইং ১৮৭২, শুভ ১লা বৈশাখ, ১২৭৯-তে 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ। 'বঙ্গদর্শন' বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র নয় বটে, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, 'বঙ্গদর্শনে'র পূর্বে কোন বাংলা মাসিক শিক্ষিত সমাজের চিত্তহরণ করিতে পারে নাই। চারি বৎসর মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন—ঐ বর্ষচতুষ্টয় বঙ্গীয় সাময়িক সাহিত্যের সুবর্ণযুগ।

'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক ভাবে 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হয়। 'বিষবৃক্ষ' অপূর্ব উপন্যাস। যখন ঐ উপন্যাস ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া বিলাতে প্রথম পরিচিত হইল, তখন একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র (Scotsman) বলিয়াছিলেন—এ গ্রন্থ

সংস্কৃত Epic কাব্যের Episode-গুলির সহিত তুলনীয়। আর একজন বলিয়াছিলেন—Sophocles-প্রণীত Antigone চরিত্রের পর আর ইহার তুল্য স্ত্রীচরিত্র কোন সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নাই।

ইং ১৮৬৫-তে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সহিত যদি বঙ্কিম-যুগের আরম্ভ ধরা যায়, তবে ১৮৯৪-তে তাঁহার তিরোধানের সহিত ঐ যুগের অবসান। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স মাত্র ৫৬ বৎসর। তাঁহার প্রতিভাস্রোতে তখনও ভাঁটা আরম্ভ হয় নাই। ঐ ৩০ বৎসরের মধ্যে শেষ দশ বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে ধর্মালোচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার 'দেবীচৌধুরাণী', 'সীতারাম'—বিশেষতঃ 'ধর্ম-তত্ত্ব (অনুশীলন)', 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'গীতাভাষ্য' ঐ সময়ের রচনা।

'দেবীচৌধুরাণী'র ঠিক পূর্ববর্তী 'আনন্দমঠ'—বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাজাত্য-বোধ ও স্বদেশানুরাগের মহোজ্জ্বল মূর্তি। তৎপূর্বে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'ভারত কলঙ্ক' প্রভৃতি বিবিধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় দেশপ্রীতির নিদর্শন পাইয়াছিলাম—বিশেষতঃ কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসবে' যোগদান করিয়া মাতৃভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়াছিলাম। সে দুর্গোৎসব মনে পড়ে কি? কমলাকান্ত সপ্তমী পূজার দিন একটু অধিকমাত্রায় আফিম চড়াইয়াছেন এবং কুহক-স্বপ্ন দেখিতেছেন। দেখিতেছেন—কালের স্রোতঃ দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিয়াছে, আর তিনি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছেন—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা! মা!' করিয়া ডাকিতেছেন—'কোথা মা! কই আমার মা!'

"সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম,—

সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম এই আমার জননী—জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্ন-ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোতঃ পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা-প্রহরণ-প্রহারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ,—আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই বঙ্গ প্রতিমা।

"কোথায় ফুল পাইলাম বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম,—ডাকিলাম, 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্বার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুলপালিকে! ধর্ম-অর্থ-সুখ-দুঃখদায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি, প্রীতি, বৃত্তি, শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি অনন্তজলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি! এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে এক কালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণ-চন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধু-সেবিতে! সিন্ধু-পূজিতে! সিন্ধু-মথন-

কারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকাল-স্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি!”

‘আনন্দমঠের’ আদ্যোপান্ত এই ঝঙ্কারে মুখরিত—এই সুষমায় মণ্ডিত। আর ‘আনন্দমঠে’র প্রধান চরিত্র—সত্যানন্দ, জীবানন্দ, শান্তি? এমন দেশপ্রাণ সেবক-সেবিকা—বাংলার জাতীয় জীবনের নির্মাতা বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন কে চিত্রিত করিতে পারিত? তাই ‘আনন্দ-মঠে’র শেষে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—“হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি মা!”

আর ‘আনন্দমঠে’র প্রাণস্বরূপ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত—‘বন্দে মাতরম্’? যাঁহার হৃদয়কন্দর হইতে এই মন্দাকিনী-ধারা উৎসারিত হইয়াছিল—যিনি দেশবাসীকে আমোঘ ‘বন্দে মাতরম্’ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন,—আমি বলিতে চাই—তিনি যদি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি না হন, তবে ঋষি কে?

প্রাচীন ভারতের মহীয়সী কীর্তির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত ছিল, তাহাও ঐ স্বাজাত্যবোধের ফল। উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্পে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি ‘সীতারামে’ লিখিতেছেন—

“পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর মূর্তি সকল যে খোদিয়াছিল, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষৎ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক—এ সকলই হিন্দুর

কীর্তি—এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

কিশোর বয়স হইতে দর্শনশাস্ত্রের প্রতি এ অক্ষমের অনুরাগ। শুনিয়াছি আমার কোনও কোনও বন্ধু বেদান্তকে আমার 'ব্যসন' বলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শত-বার্ষিকীর সুযোগে তাঁহার দার্শনিক মতের একটু নিবিড়ভাবে আলোচনা ও সমালোচনা করিয়া আমি 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঐ গ্রন্থের প্রথম চারি অধ্যায় লিখিত হইয়াছে—আরও আট অধ্যায় লিখিতে হইবে। আমার ইচ্ছা ছিল দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এই সভায় আপনাদের সঙ্গে কিছু চিন্তা বিনিময় করি; কিন্তু সময়াভাব, বিশেষতঃ আপনাদের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কা। সেই জন্য সংক্ষেপে একটি মাত্র প্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ অবতারণা করিব।

ধর্ম ও দর্শনের এক প্রধান সমস্যা অবতারবাদ। অশরীরী পরমেশ্বরের মনুষ্য শরীর ধারণ সম্ভব কিনা? এ দেশের কথা এই—শ্রীভগবান্ আশ্চর্যকর্মা—অরূপ হইয়াও বহুরূপ,—

অরূপায়োরুরূপায় নমো হ্যাশ্চর্যকর্মণে! নিপট অদ্বৈতী শঙ্করাচার্যের ভাষায় বলি—স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানু-গ্রহার্থম্ (১।১।২০ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য)।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' ঐ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন—ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? উত্তরে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন —"যিনি ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন? তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার এ সীমা নির্দেশ কর কেন?" * * ঈশ্বর ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্—'তিনি অবতীর্ণ হইতে পারেন না' এমন কথা বলিলে তাঁহার শক্তির সীমা

নির্দেশ করা হয় (গীতাভাষ্য)। অবশ্য যাঁহার কটাক্ষমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় সাধিত হয়, কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে তাঁহাকে ভূতলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, (বঙ্কিমচন্দ্র বলেন) ইহা অসম্ভব কথা বটে। তবে অবতার কেন? ঈশ্বরের অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি?

পূর্ণ আদর্শ ভিন্ন প্রকৃত ধর্মসংস্থাপন সম্পন্ন করা অসম্ভব। জীবের সমক্ষে এই পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শনের জন্যই অবতার স্বীকার করিয়া ভগবানের সান্ত ও সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথায় বলি—

'সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই।, কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। * * অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। * * এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি?' (কৃষ্ণচরিত্র)

বৈজ্ঞানিক-প্রবর স্যার অলিভার লজ্ ভগবানের অবতার-গ্রহণের প্রয়োজন অন্যরূপে সিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবানের ঐশ্বর্য এতই বিরাট্, তাঁহার প্রভাব এতই প্রচণ্ড যে, তিনি যদি অবতাররূপে নিজেকে সঙ্কুচিত ও সংকীর্ণ না করেন, তবে কেহই তাঁহার অনাবৃত মুখ দর্শন করিতে পারে না। এইজন্যই খৃষ্টানেরা বলেন, "No man can see My face and live"। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্যার অলিভার লজ্ রবি ও রশ্মির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সূর্য সমস্ত পৃথিবীর প্রাণ—সূর্যরশ্মি দ্বারাই পৃথিবী পুষ্ট, বর্ধিত ও সঞ্জীবিত আছে; কিন্তু কোনদিন সূর্য যদি নিজের প্রচণ্ড মার্তণ্ড মূর্তিতে প্রকটিত হন, তাহার ফলে কি হয়? সমস্ত পৃথিবী মুহূর্ত মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া

পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হয়। সাগর, নদী, পর্বত, প্রস্তর, প্রান্তর, তরু, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—কেহই ক্ষণার্ধ তিষ্ঠিতে পারে না। সেইজন্য সূর্যের তেজঃ বায়ুস্তরের দ্বারা প্রশমিত হইয়া সংবৃত মূর্তিতে রশ্মিরূপে আমাদের গোচর হয়। এই সংবৃতির ফলেই সূর্যের উপকারিতা। ভগবানের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। সাধারণ মানুষের ত' কথাই নাই, বোধ হয় অত্যুত্তম সাধকেরাও তাঁহার অনাবৃত ঐশ্বর্য, তাঁহার প্রকটিত মহিমা ধারণ করিতে পারেন না। সেইজন্যই তিনি অবতারের রূপে নিজেকে সংবৃত করিয়া, সেই আবরণের মধ্যে নিজের তেজঃ প্রশমিত করিয়া, জীবের নিকট প্রকাশিত হন।

স্যার অলিভার লজের কথাগুলি বেশ সঙ্গত। আমাদের দেশে গঙ্গা-অবতরণের যে কাহিনী পুরাণের মধ্যে রক্ষিত আছে, তদ্দ্বারা ঐ কথার সমর্থন হয়। গঙ্গাকে বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা বলে। একদিন সাধকপ্রবর ভগীরথের আবাহনে ভগবানের আধ্যাত্মিক শক্তি ভূমণ্ডলে গঙ্গারূপে অবতরণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই শক্তিকে মনুষ্যের ধারণ-উপযোগী করিবার জন্য প্রথমতঃ মহাদেবকে জটার মধ্যে সংবৃত করিতে হইয়াছিল এবং পরে জহ্নুমুনির শরীরের মধ্যে সংগোপিত করিতে হইয়াছিল। সেইজন্য গঙ্গার নাম জাহ্নবী। এইরূপে দ্বিধা-শিথিলিত বিষ্ণুতেজঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলে, তবে গঙ্গা আমাদের ধারণ-উপযোগী হইয়া পতিতপাবনী হইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও 'ধর্মতত্ত্বে' এ বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন—"ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি—আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়? * * অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায়

তাহারা আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য ; কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন।"

'দেবী চৌধুরাণী'তে একথা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে—"ঈশ্বর অনন্ত—কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না—সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর—হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।"

যাহা হ'ক, এ বিষয়ের আর বিস্তার করিব না। আমার বক্তব্যের মুখ্য কথা এই, বঙ্কিমস্মৃতি বাঙ্গালীর নিকট যেন চিরোজ্জ্বল হইয়া থাকে। এই উৎসবের ফলে সে প্রয়োজন যদি অংশতঃও সুসিদ্ধ হয়, তবে আমাদের উদ্‌যোগ-আয়োজন নিষ্ফল হইবে না।

'গ' পরিশিষ্ট

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি

[ঢাকা বঙ্কিম শতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত
'বঙ্কিমস্মৃতি' হইতে পুনর্মুদ্রিত]

ইংরাজিতে যাহাকে 'Patriotism' বলে, সংস্কৃতে তাহার প্রতিশব্দ নাই। কেন নাই? বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' ইহার একটা উত্তর দিয়াছেন। তাহার মর্ম এই যে, প্রাচীন আর্যেরা সার্বভৌম ভাবে ভাবিত ছিলেন—তাঁহারা সকলকে সমদৃষ্ট করিতেন। তাঁহারা অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলিতেন—

মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
ভ্রাতরো মনুজাঃ সর্বে স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

অতএব 'দেশপ্রীতি'কে তাঁহারা সার্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। এখন যুগ-প্রয়োজনে আমরা 'স্বাজাত্যবোধ' বা 'স্বদেশপ্রীতি'—'Patriotism' শব্দের প্রতিশব্দরূপে প্রচলিত করিয়াছি বটে—কিন্তু স্মরণ রাখা ভাল, ইহা 'দেশী কথা নহে, বিলাতি আমদানী'।

এই স্বদেশপ্রীতি সম্পর্কে 'ধর্মতত্ত্বে'র চতুর্বিংশ অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র অতি মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—'সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্মজীবন নাই। সমাজধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্মধ্বংস ও সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গলধ্বংস। যদি তাহাই হইল, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। অর্থাৎ,

আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং এই জন্যই সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সেই কারণেই স্বজন-রক্ষা অপেক্ষাও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম।'

'ধর্মতত্ত্বে'র উপসংহারে ইহার পুনরুক্তি আছে—

'সর্ব ভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।'

'আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া—এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশ-প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।'

'সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।'

কিন্তু Patriotism-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এক বিষয়ে আমাদের খুব সতর্ক করিয়াছেন। তিনি বলেন—

'আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism-ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism-প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতি-সকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য-ধর্ম না লিখেন।'

তবে প্রকৃত স্বদেশপ্রীতির মাপকাঠি কি? বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর শুনুন—

'পরসমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া আমার সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না এবং আমার সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া কাহাকেও আপনার

সমাজের ইষ্ট সাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন, এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য।'

যাঁহার দৃষ্টি এইরূপ উদাত্ত ছিল, তিনি যে স্বাজাত্যবোধে অন্ধ হইয়া অন্য সমাজ বা সম্প্রদায়ের উপর বিদ্বেষ পোষণ করিতেন, ইহা অসম্ভব। তথাপি দেখিতে পাই, বঙ্কিমসাহিত্যে অনভিজ্ঞেরা সম্প্রতি একটা ধূয়া তুলিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র নাকি মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন। এ অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। সত্য বটে, 'মৃণালিনী', 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম' —বিশেষতঃ, 'রাজসিংহ' উপন্যাসে কোন কোন মুসলমান রাজা ও রাজপুরুষদিগকে তিনি আখ্যান-বস্তুর যাথার্থ্য ও ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন—কিন্তু সে চিত্রণ আদৌ বিদ্বেষমূলক নহে।

'রাজসিংহে'র উপসংহারে তাঁহার নিজের কথা শুনুন—

"গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না,—মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না। অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না,—মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, মুসলমান রাজাসকল হিন্দু রাজাসকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমানই হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অনেক স্থলে হিন্দু রাজা মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে—হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, সেই শ্রেষ্ঠ।

অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই—সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়াও মোগল বাদশাহকে অপমানিত ও পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। রাজা যেরূপ হয়েন, রাজানুচর ও রাজপৌরজন প্রভৃতিও সেইরূপ হয়। উদিপুরী ও চঞ্চলকুমারীর তুলনায়, জেবউন্নিসা ও নির্মলকুমারীর তুলনায়, মাণিক-লাল ও মবারকের তুলনায় ইহা জানিতে পারা যায়। এই জন্য এই সকল কল্পনা।

ঔরঙ্গজেবের উত্তম ঐতিহাসিক তুলনার স্থল স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ্। উভয়েই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধিপতি; উভয়েই ঐশ্বর্যে, সেনাবলে, গৌরবে আর সকল রাজগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উভয়েই শ্রমশীলতা, সতর্কতা প্রভৃতি রাজকীয় গুণে বিভূষিত ছিলেন, কিন্তু উভয়েই নিষ্ঠুর, কপটাচারী, ক্রূর, দাম্ভিক, আত্মমাত্রহিতৈষী এবং প্রজাপীড়ক। এজন্য উভয়েই আপন আপন সাম্রাজ্যধ্বংসের বীজবপন করিয়া গিয়াছিলেন। উভয়েই ক্ষুদ্র শত্রুদ্বারা পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন,—ফিলিপ্ ইংরেজ (তখন ক্ষুদ্রজাতি) ও ওলন্দাজের দ্বারা, ঔরঙ্গজেব মারহাট্টা ও রাজপুতের দ্বারা। মারহাট্টা শিবজী ও ইংলণ্ডের তৎকালিক নেত্রী—এলিজাবেথ পরস্পর তুলনীয়। কিন্তু তদপেক্ষা ওলন্দাজ উইলিয়ম্ ও রাজপুত রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে তুলনীয়। উভয়ের কীর্তি ইতিহাসে অতুল। উইলিয়ম্ ইউরোপে দেশহিতৈষী ধর্মাত্মা বীরপুরুষের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন—এ দেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।"

বস্তুতঃ যাহাকে আমরা ইদানীং Hindu-Moslem Solidarity বলি—হিন্দু-মুসলমানের ঐ হার্দিক ঐক্য ও আন্তরিক যোগাযোগ ভিন্ন এই খণ্ড ভারতে যে এক মহাভারত স্থাপিত হইতে পারে না—বঙ্কিমচন্দ্র এ তথ্য বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 'Without a solid India, we are not going to get anywhere'—একথা বঙ্কিমচন্দ্রের একেবারেই অবিদিত ছিল না।

অনেক পাঠকই বোধ হয় অবগত আছেন বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'সীতারাম' ১৮৮৪-৫ খৃষ্টাব্দে 'প্রচারে' প্রকাশিত হইয়াছিল। স্মরণ রাখিবেন তখনও আমাদের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান Indian National Congress-এর সূচনা হয় নাই। ১২৯২ শ্রাবণের 'প্রচারে' প্রকাশিত 'সীতারামে'র একাংশ—যাহা 'সীতারামে'র পরবর্তী সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই—তৎপ্রতি সুলেখক হেমেন্দ্রনাথ দাশ মহাশয় সম্প্রতি 'বঙ্গশ্রীতে' আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। দেখা যায় চাঁদশা ফকিরের প্রমুখাৎ বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে বলিতেছেন—

"বাবা! শুনিতে পাই তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু-মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু-মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই একজনই হিন্দু-মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান। উভয়েই তোমার প্রজা হইবে। অতএব দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।

আর যখন তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর হিন্দুতে আছেন মুসলমানেও আছেন, তখন তুমি কেন প্রভেদ করিবে? আমি মুসলমান হইয়াও হিন্দু-মুসলমানে কোন প্রভেদ করি না।"

সীতারাম চাঁদশা ফকিরের ধার্মিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত রাজধানীতে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। এ সম্পর্কে উভয়ের যে কথাবার্তা হইল, তাহা লক্ষ্য করা উচিত—

ফকির। তুমি একটি কথা আমার নিকট স্বীকৃত হইলে, আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি। তুমি রাজধানীর কি নাম দিবে?

সীতা। শ্যামাপুর নাম আছে—সেই নামই থাকিবে।

ফকির। যদি উহার 'মহম্মদপুর' নাম দিতে স্বীকৃত হও, তবে আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি।

সীতা। এ নাম কেন?

ফকির। তাহা হইলে আমি খাতিরজমা থাকিব যে তুমি হিন্দু-মুসলমানে সমান দেখিবে।

এ সম্পর্কে সম্প্রতি সুধী নরেন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমাদের প্রণিধান-যোগ্য।

'বস্তুতঃ তাঁহার দেশপ্রীতি ও দেশধর্ম কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিজাত নহে। তাহার মূলে আছে—সমগ্র জাতির মানুষের প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ মমত্ব-বোধ ও রক্ত-ধারার প্রতি তাঁহার অপরিমিত শ্রদ্ধা।'

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি কতদূর প্রখর ও প্রগাঢ় ছিল—তিনি দেশমাতৃকাকে কিরূপ আন্তরিকতার সহিত ভালবাসিতেন—'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'ভারত-কলঙ্ক', 'বাঙ্গালীর বাহুবল' প্রভৃতি বিবিধ ঐতি-

হাসিক প্রবন্ধে তাহার কতক নিদর্শন পাওয়া যায়। সে যুগের একজন সিভিলিয়ন্ ভারতীয় নেটিবকে 'বিনীত' হইতে উপদেশ দিয়াছিল। তদুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

'অদ্যাপি মহাভারত রামায়ণ পড়ি, মনু যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা-অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতের অতুল্য ভাষায় ঈশ্বরারাধনা করি। যতদিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি, ততদিন বিনীত হইতে পারিব না।'

উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

'পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদের এই হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর মূর্তি সকল যে খোদিয়াছিল, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষৎ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক—এ সকলই হিন্দুর কীর্তি এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।'

ইহা স্বাজাত্য-বোধের অমৃতময় ফল। কিন্তু 'আনন্দ-মঠ'ই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির মহোজ্জ্বল মূর্তি। তাহার বহুপূর্বে রচিত কমলাকান্তে 'আমার দুর্গোৎসব' মনে পড়ে কি? কি মাতৃভক্তির উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস!

কমলাকান্ত সপ্তমীর পূজার দিন একটু অধিকমাত্রায় আফিম চড়াইয়াছেন এবং কুহক-স্বপ্ন দেখিতেছেন। দেখিতেছেন—কালের স্রোতঃ দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিয়াছে—আর তিনি ভেলায়

চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছেন—নিতান্ত একা—মাতৃহীন। কমলাকান্ত 'মা' 'মা' করিয়া ডাকিতেছেন—'কোথা মা! কই আমার মা!'

'সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্‌মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল। সেই তরঙ্গ-সঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে,—ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম এই আমার জননী-জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী, মৃত্তিকারূপিণী অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না, কালস্রোতঃ পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণ-ধারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠ-বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান-মূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ—আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা।'

কমলাকান্ত সেই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ডাকিলেন—'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্বার্থ-সাধিকে! অসংখ্য সন্তানকুলপালিকে! ধর্ম-অর্থ-সুখ-দুঃখ দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি, প্রীতি, বৃত্তি, শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি অনন্ত জলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি!

এসো মা গৃহে এসো—ছয়কোটি সন্তানে একত্রে এককালে, দ্বাদশ কোটি কর জোড় করিয়া পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয়কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্য-দায়িকে! নগাঙ্ক-শোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরী চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব, সিন্ধুসেবিতে! সিন্ধুপূজিতে! সিন্ধুমথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্ত-শ্রী—অনন্তকালস্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তি প্রদায়িনি!'

কমলাকান্তের এই দুর্গোৎসবেই আমরা আমাদের অমোঘ অমিতদ্যুতি জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্'-এর উৎস দেখিতে পাই। যাঁহার হৃদয়-কন্দর হইতে এই মন্দাকিনীধারা উৎসারিত হইয়াছিল—যিনি দেশবাসীকে এই অমোঘ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন—তিনি যদি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি না হন, তবে ঋষি কে?

এ সঙ্গীত দৈবপ্রেরণায় রচিত। বঙ্কিমের হৃদয়তন্ত্রী সাময়িকভাবে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষের স্পর্শে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। তাই বঙ্কিম ঐ মন্ত্রের দ্রষ্টা মাত্র—রচয়িতা নন। সম্প্রতি এই 'বন্দেমাতরম্' গীতের অঙ্গহানি করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। যাহারা এরূপ প্রস্তাব করিতেছে আমি তাহাদিগকে পামর বিবেচনা করি।

এই 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি—

There are some songs in the hymnology of the world, which, having caught and captured the imagination of a whole nation, become 'national' songs in the true sense of the term. Such songs are divinely inspired—the mind of the poet who writes the song, being merely the harp which is played upon by the breath of

the Invisible, Who becomes the real composer. The French National anthem, *La Marseillaise* is one of such inspired songs. It was composed in 1793 by Rouget de Lisle, a Republican officer of the time, and was first sung in Paris by volunteers from Marseilles (hence called '*Marseillaise*'). Bankim Chandra's '*Bande Mataram*' is another such inspired song.

I have heard *La Marseillaise* sung by a deep tenor voice. It is really inspiring. It sheerly lifts you out of yourself and transports you to the region of the super-sensual. The *Bande Mataram* song, when rightly sung, has exactly the same effect. I had, many years ago, the good fortune of hearing Bande Mataram sung at the opening of a session of the Indian National Congress at Calcutta. The singer on the occasion was no other than Rabindra Nath Tagore. As I watched from the platform the vast audience gathered together from all parts and provinces of India, I could see that they were visibly moved. For the moment, they were lifted out of themselves and their consciousness caught something of the spiritual message of the song—the message of one-pointed devotion to the Common Mother and of determination to stake one's all at the altar of patriotism.

এই অমোঘ জাতীয়সঙ্গীত যে 'আনন্দমঠে'র প্রাণস্বরূপ—সেই 'আনন্দমঠ' আদ্যোপান্ত ঐ মহোজ্জ্বল স্বাজাত্যবোধের ঝঙ্কারে মুখরিত,

ঐ অতুল্য স্বদেশানুরাগের সুষমায় মণ্ডিত। আর 'আনন্দমঠে'র প্রধান চরিত্র সত্যানন্দ, জীবানন্দ, শান্তি? এমন দেশ-প্রাণ সেবক-সেবিকা—বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের নির্মাতা বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন কে চিত্রিত করিতে পারিত? তাই 'আনন্দমঠে'র শেষে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি মা!'

আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে স্বাজাত্যবোধের আদ্যাচার্য বলিতে চাই—The real Father of Indian Nationalism। এ কথার যাথার্থ্য বুঝিতে হইলে বঙ্কিমযুগের প্রভাতে দেশের প্রচলিত আবহাওয়ার কিছু পরিচয় জানা আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই কলিকাতায় হিন্দু কলেজ এবং প্রত্যেক জেলায় ইংরেজী জেলা-স্কুল ও কোথাও কোথাও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার যখন ২০ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও প্রতিপত্তি আরও বদ্ধমূল হইল। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার মাদক বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া উহাকে বিলোড়িত ও বিকৃত করিল। বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত হইল—সে ভুলিয়া গেল সে ঋষি-সন্তান—প্রাচীনতম সভ্যতার উত্তরাধিকারী। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এইরূপ লিখিয়াছেন—'আমাদের মধ্যে এমন অনেক বাবু আছেন, কাচের টাম্বলারে না খাইলে তাঁহাদের জল মিষ্ট লাগে না।' ফলতঃ, বাঙ্গলার আকাশ বাতাস বিজাতীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইল এবং ভারতীয় কৃষ্টি (Culture) অতলে নিমগ্ন হইবার সম্ভাবনা বেশ প্রবল হইয়া উঠিল।

ভারতের অতীত ইতিহাসে এরূপ সঙ্কট অবস্থা আরও কয়েকবার ঘটিয়াছিল। গ্রীক্, পারসিক, শক, হূন, তাতার, তুর্কী, পাঠান,

মোগলের জয়প্লাবনে তখন ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেহই ভারতীয় কৃষ্টিকে পর্যুদস্ত করিতে পারে নাই। প্রতিবারই গ্রসিষ্ণু ভারতীয় কৃষ্টি ঐ সকল সভ্যতাকে আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং ঐ সকল সংস্পর্শের ও সংঘর্ষের ফলে ভারতীয় সভ্যতা আরও সমৃদ্ধ ও বিচিত্র হইয়াছিল। কিন্তু এবার সমুদ্রপার হইতে বাণিজ্য-ব্যপদেশে যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার তরঙ্গ ভারতের মর্মগ্রন্থিতে আঘাত করিতেছিল। মনে হইয়াছিল, এইবার বুঝি ভারতীয় কৃষ্টি অভিভূত হইয়া যাইবে—নিমজ্জিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু ভারতীয় কৃষ্টির বিরাট্ বুভুক্ষা এবারও তাহাকে রক্ষা করিল, এবং এই রক্ষাকার্যে প্রধান কর্ণধার হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি নীলকণ্ঠরূপে বিদেশীয় সভ্যতার বিষ পান করিয়া তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং অল্প ইংরেজীতে শিক্ষিত 'স্বধর্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য' বঙ্গীয় যুবককে (বিশেষণগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের) স্বধর্মে ও স্বাজাত্যে এবং স্বীয় সংস্কৃতিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি আমাদের অন্তরে যে স্বদেশানুরাগের বহ্নি সন্ধুক্ষিত করিয়াছিলেন, আমরা যেন হোমাগ্নির ন্যায় সেই অগ্নি চিরোজ্জ্বল রাখি—তবেই আমাদের বঙ্কিমের স্মৃতিপূজা সার্থক হইবে।

'ঘ' পরিশিষ্ট

GENESIS OF "BANDE MATARAM"

the Divinely Inspired National Anthem of India

(Reprinted from Hindusthan Standard)

There are some songs in the hymnology of the world, which, having caught and captured the imagination of a whole nation, become 'national' songs in the true sense of the term. Such songs are divinely inspired—the mind of the poet who writes the song, being merely the harp which is played upon by the breath of the Invisible, Who becomes the real composer. The French National anthem, *La Marseillaise* is one of such inspired songs. It was composed in 1793 by Rouget de Lisle, a Republican officer of the time, and was first sung in Paris by volunteers from Marseilles (hence called 'Marseillaise'). Bankim Chandra's '*Bande Mataram*' is another such inspired song.

I have heard *La Marseillaise* sung by a deep tenor voice. It is really inspiring. It sheerly lifts you out of yourself and transports you to the region of the super-sensual. The *Bande Mataram* song, when rightly sung, has exactly the same effect. I had, many years ago, the

good fortune of hearing Bande Mataram sung at the opening of a session of the Indian National Congress at Calcutta. The singer on the occasion was no other than Rabindra Nath Tagore. As I watched from the platform the vast audience gathered together from all parts and provinces of India, I could see that they were visibly moved. For the moment, they were lifted out of themselves and their consciousness caught something of the spiritual message of the song—the message of one-pointed devotion to the Common Mother and of determination to stake one's all at the altar of patriotism.

In recent months, questions and contentions have arisen as to the suitability of Bankim's *Bande Mataram* being adopted as the national hymn of India—the hymn of homage to the Motherland. It has been even suggested that *Bande Mataram* is a hymn of hate—hate of the Moslem, who is an integral part of Indian nationhood. The basis of this suggestion is that the song occurs in Bankim's *Ananda Math*, where the novelist, for the sake of historical verisimilitude, felt called upon to depict in rather dark colours the anarchy and oppression that followed in the wake of the battle of Plassey—an interregnum when the administration at Murshidabad ceased to control affairs and the East India Company, though actually invested with power, were yet mere foreign

traders who had not yet grasped the reins of rule. In drawing a portrait of contemporary Bengal, Bankim Chandra had to speak in harsh terms about Muhammad Reza Khan. That was a mere accident, because a Hindu Izaradar in Reza's position would have behaved exactly, perhaps, as Reza did. The true attitude of Bankim Chandra towards Islamic rule and culture in India was defined by himself in the concluding chapter of his famous historical novel *Raj Singha.* It is worthwhile giving a literal translation of that remarkable passage.

"One is not good because he is a Hindu nor bad because he is a Muhammedan. Nor is it true that all Hindus are bad and all Muhammedans are good. There are good men and bad men equally in both the communities. It has also to be admitted that as the Mussalman was the ruler in India for so many centuries, he surely excelled his contemporary Hindu in the qualities of the ruler. But it is not true that all Mussalman rulers were better than Hindu rulers. In some cases the Muhammedan ruler was better and in some cases the Hindu ruler was better. The truth is that he who combines spirituality with other kingly qualities comes to excel, be he Hindu or Moslem."

Communalists (and unfortunately communalism is just now running rampant) should bear these wise observa-

tions of Bankim in mind, should they ever desire to turn a new leaf.

It should also be borne in mind that though the *Bande Mataram* song has come to be associated with the novel, *Ananda Math*, the ideas and sentiments which underlie that song had taken definite shape in Bankim's mind, many many years before *Ananda Math* was written. This becomes quite clear if we turn to his rhapsody "My Durgotsava" in *Kamalakanta*. As a piece of literature, this rhapsody has very few parallels, and every Bengali-knowing person should make it a point to read it and re-read it. But what I am concerned with at the moment, is to draw pointed attention to the fact that this rhapsody, if placed by the side of "Bande Mataram", cannot fail to convince any discerning reader that the *Bande Mataram* song is only the versified form (set to music) of those high, noble and lofty sentiments and aspirations which inspired Bankim from early manhood and made him what he was—the real Father of Indian Nationalism.